POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ○

এবং তাহারা তাঁরই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়; (এবং তাহাদিগকে বলে) আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহারা করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।

(সূরা দহর, আয়াত: ৯-১০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 15

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9 Apr 2026 20 শওয়াল 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

লায়তাতুল কদর এর ফজিলত

হযরত আবু হুরাইরাহ(রাঃ) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সা.) বলেছেন:

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার খোঁজখবর নাওনি।" তখন সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো সমগ্র জগতের পালনকর্তা–তুমি কিভাবে অসুস্থ হতে পারো? আর আমি কিভাবে তোমার খোঁজখবর নিতাম?"আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, অথচ তুমি তার খোঁজ নিতে যাওনি? তুমি কি বুঝতে পারনি যে যদি তুমি তার খোঁজ নিতে যেতে, তবে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে? তার সেবা করাই আমার সেবা ছিল।"

আল্লাহ আবার বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো সমগ্র জগতের পালনকর্তা, খাদ্যের মুখাপেক্ষী নও। আমি কিভাবে তোমাকে খাদ্য দিতাম?"আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি? তুমি কি বুঝতে পারনি যে যদি তুমি তাকে খাদ্য দিতে, তবে যেন তুমি আমাকে খাদ্য দিলে?

আল্লাহ আরও বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো সমগ্র জগতের পালনকর্তা, তৃষ্ণামুক্ত। আমি কিভাবে তোমাকে পানি পান করাতাম?"আল্লাহ বলবেন, "আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি কি বুঝতে পারনি যে যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তবে যেন তুমি আমাকে পানি পান করালে, এবং আমি তোমাকে তার প্রতিদান দিতাম?

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ও সিলা, রোগীর খোঁজখবর নেওয়ার ফজিলত সংক্রান্ত অধ্যায়; হাদীকাতুস সালিহীন, হাদিস নং ৫৮৩)

প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বন্দীদের খাদ্য দান করে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পবিত্র বাণী

'তাআম' (খাদ্য) শব্দটি উৎকৃষ্ট, পুষ্টিকর ও পছন্দনীয় খাদ্যকে নির্দেশ করে; পচা বা বাসি খাদ্যকে 'তাআম' বলা যায় না। মূলত, যদি এমন একটি পাত্র থেকে–যেখানে তাজা, সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবার রাখা আছে এবং এখনো খাওয়া শুরু হয়নি–কোনো দরিদ্র ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার জন্য কিছু অংশ বের করে দেওয়া হয়, তবে সেটিই প্রকৃত সৎকর্ম। কিন্তু অকেজো বা নিম্নমানের জিনিস ব্যয় করে কেউ নেকির দাবিদার হতে পারে না। নেকির পথ সংকীর্ণ; অতএব, এটি সুস্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে, মূল্যহীন জিনিস ব্যয় করে সেই পথে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

(রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭, পৃ. ৭৯)

নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের পাশাপাশি, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দান–খয়রাত করার অভ্যাসও গড়ে তোলা উচিত।

যেমন আয়াতে বলা হয়েছে: يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا "তারা আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বন্দীদের খাদ্য দান করে–অর্থাৎ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দরিদ্র, অনাথ ও বন্দীদের আহার প্রদান করে এবং বলে: "আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাওয়াই; আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। নিশ্চয়ই আমরা এক ভয়াবহ দিবসকে ভয় করি।"

(আল–হাকাম, খণ্ড ৫, সংখ্যা ২৭, ২৪ জুলাই ১৯০১, পৃ. ২)

প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বন্দীদের খাদ্য দান করে এবং বলে: "আমরা তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই দান করি; আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি না।"

(সিরাজউদ্দিন মাসীহীর চার প্রশ্নের উত্তর, পৃ. ৪২) (তাফসির হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), খণ্ড ৩, সূরা আদ–দাহর)

যদি কোনো মানুষের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকত এবং তাদের কষ্ট দূর করার আন্তরিক অনুভূতি বিদ্যমান থাকত, তবে তার কর্তব্য ছিল অনাহারের দিনগুলিতে তাদের খাদ্য প্রদান করা।

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ○ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ○ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ○

অর্থ: "অথবা ক্ষুধার দিনে খাদ্য দান করা–নিকট আত্মীয় অনাথকে, অথবা ধূলিধুসরিত দরিদ্রকে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) উপরোক্ত আয়াত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

যদি কোনো মানুষের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকত এবং তাদের কষ্ট দূর করার আন্তরিক অনুভূতি বিদ্যমান থাকত, তবে তার কর্তব্য ছিল অনাহারের দিনগুলিতে তাদের খাদ্য প্রদান করা। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময় তাদের খোঁজখবর নেওয়া কিংবা দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থায় তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা। একথা স্বীকার করে নিলাম যে সে এক দিনে শত শত উট জবাই করত; কিন্তু আমরা বলি, এই জবাই যথাস্থানে করা হয়নি। এর উপযুক্ত সময় ছিল তখন, যখন সে অনাথ ও দরিদ্রদের জন্য উট জবাই করে তাদের মধ্যে মাংস বণ্টন করত, অথবা তা রান্না করে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করত।

"ক্ষুধার দিনে–এই শব্দগুচ্ছটি বিশেষ প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এমন ব্যক্তি নিজের সম্পদ ব্যয় করে খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এতে ধারণা জন্মাতে পারত যে হয়তো সে অনাথ ও দরিদ্রদেরও আহার করায়। কিন্তু আল্লাহ্ এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, সে সম্পদ ব্যয় করে এবং উটও জবাই করে, কিন্তু ক্ষুধার দিনে নয়–অর্থাৎ যখন প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রদের প্রয়োজন থাকে, তখন নয়। বরং যখন আত্মপ্রদর্শনের উন্মাদনা তাকে আচ্ছন্ন করে, তখন সে এক দিনে শত শত উট জবাই করে। অথচ যদি সে প্রকৃত প্রয়োজন বিবেচনায় কাজ করত, তবে বন্ধুদের আপ্যায়নের জন্য একটি উটই যথেষ্ট মনে করত এবং অবশিষ্ট নিরানব্বইটি উট অনাথ ও দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষণ করত, যাতে তারা অনাহারের কষ্ট থেকে রক্ষা পেত। সুতরাং, যেহেতু সে সামষ্টিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেছে এবং অযথাস্থানে সম্পদ অপচয় করেছে, তাই আমাদের দৃষ্টিতে সে কোনো প্রশংসা বা সম্মানের যোগ্য নয়।

তদুপরি, "নিকট আত্মীয় অনাথ–এই বাক্যাংশের সংযোজন এই নির্দেশ করে যে আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে থাকা অনাথ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের প্রত্যক্ষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তার ভরণপোষণ–যেমন খাদ্য, শিক্ষা ও বস্ত্রের ব্যয়–মানুষকে বহন করতেই হয়, তা সে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়; কারণ পারিবারিক দায়িত্ব তা দাবি করে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, তোমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের নিকট আত্মীয় অনাথকেও খাদ্য দাও না। এটি গভীর নৈতিক অবক্ষয়ের প্রমাণ।

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে কেবল নিকট আত্মীয় অনাথকেই খাওয়াতে হবে, অন্যদের নয়। বরং এর তাৎপর্য হলো–যদি কেউ নিজের নিকট আত্মীয় অনাথদের প্রতিও দায়িত্ব পালন না করে, তবে দূরবর্তী দায়িত্ব পালনের প্রত্যাশা করা অবাস্তব। যখন নিকট দায়িত্বেই এমন অবহেলা, তখন দূরের দায়িত্ব পালনের দিকে মনোযোগ কিভাবে প্রত্যাশিত হতে পারে?

(তাফসীর কবীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬২৪, কাদিয়ান মুদ্রিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
সম্পাদকীয়
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সফর বৃত্তান্ত
সীরাত খাতামান্নাবীঈন (সা.)
সীরাতুল মাহদী

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ইরান–যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীকে ব্যাথাতুর দোয়ার আবেদন।

৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রদত্ত জুমার খুতবায় ইরান–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিশ্বে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তরিক উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান স্থাপন করা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করা, এ লক্ষ্যে চেষ্টা করা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকারসমূহ আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা করা। আরও উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। কিন্তু আজ আমরা কলেমা পাঠ করার দাবি করা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ নই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের দাবিকৃত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়। কিছু দেশের কাছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও ধন–সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির সামনে তাদের কোনো বিশেষ অবস্থান নেই; দ্বীনের উন্নয়নে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই; ইসলামি শিক্ষার ওপর আমল করার ক্ষেত্রেও কোনো দৃশ্যমান চেষ্টা নেই। এর ফল স্পষ্ট–অন্যরা এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করছে।

মুসলমানদের উচিত একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কেবল তখনই তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে পারবে এবং ইসলামবিরোধী শক্তিকে অভ্যন্তরীণ বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন এই বিষয়ে চিন্তা করা যে, আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে, ইউরোপীয় দেশগুলো পরিস্থিতির অবনতিতে ভূমিকা রাখবেই, তবে ইসলামী দেশগুলিও এই বিশৃঙ্খলার অংশীদার হচ্ছে। পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথমে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করেছে এবং এখন তাদের সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলমানদের বোঝা উচিত যে, এই তথাকথিত দাজ্জালী শক্তিগুলো কখনোই মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে দিতে চায় না। তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুসলিম বিশ্বে সর্বদা অশান্তি সৃষ্টি করে রাখা।

আজ আমাদের দায়িত্ব হলো দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সামনে নত হওয়া এবং মুসলিম বিশ্বের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা।

যুক্তরাষ্ট্র বহু মুসলিম দেশে অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে–কিন্তু কেন? এগুলো কি সত্যিই ওই দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য? আরব দেশগুলো কার কাছ থেকে হুমকির সম্মুখীন ছিল? এসব শক্তি নিজেরাই হুমকি সৃষ্টি করেছে এবং তারপর মুসলিম দেশগুলোকে এই ধারণা দিয়েছে যে, তাদের নিরাপত্তার জন্য এসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম দেশগুলো যে শক্তির কাছ থেকে প্রকৃত হুমকির সম্মুখীন, তাদের বিরুদ্ধে এসব ঘাঁটি কখনো ব্যবহার করা হবে না।

ইরান দীর্ঘদিন ধরেই এসব দেশের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের নীতি ছিল তুলনামূলক কঠোর, এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্যও ছিল। বিশ্বশক্তিগুলো এসব বিষয়কে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। এসব সামরিক ঘাঁটির কারণেই আরব দেশগুলো হামলার ঝুঁকির মুখে পড়ে এবং হামলাও সংঘটিত হয়, যার ফলে তাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির লাভ বিশ্বশক্তিগুলিই পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে।

ইরাক যুদ্ধের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছিলেন যে, এই অশান্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। আফসোস, মুসলিম দেশগুলো যদি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত!

এই অস্থিরতা মূলত এসব বিশ্বশক্তিরই সৃষ্টি, এবং আপাতদৃষ্টিতে এর অবসানের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না–যদি না আল্লাহ্ তাআলার কোনো বিশেষ তাকদীর কার্যকর হয়। তবুও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং এ জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে।

যেভাবে দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মনে হয় যে, বৃহৎ পরিসরের একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে। বরং কিছু পশ্চিমা বিশ্লেষকের মতে, বিশ্বযুদ্ধ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে–আমিও তাই মনে করি। তবে এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করে, তাহলে তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে যে সংঘাত চলছে, তা দেখতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের ওপর হামলার মাধ্যমে শুরু হয়েছে বলে মনে হয়; কিন্তু এর আগে ইরান সতর্ক করেছিল যে, তাদের ওপর হামলা হলে তারা আরব দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে আঘাত হানবে–এবং ঠিক সেটিই ঘটেছে। 'রেজিম পরিবর্তন'–এর স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এর ফল কী হলো? আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে; তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যা করা হলেও তাতে কোনো শাসন পরিবর্তন ঘটেনি–বরং তাঁর জাতি আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর নিজস্ব প্রতিরক্ষামূলক শক্তি নেই; তারা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা শক্তির ওপর নির্ভরশীল। এই যুদ্ধ এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। একদিকে তেলের কূপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরব শক্তিগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ছে; অন্যদিকে এই যুদ্ধে মার্কিন প্রতিরক্ষা সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের বিপুল ব্যয় বহন করতে হবে। এসব কারণে আরব বিশ্বের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলোর নীতিই অনুসরণ করছেন। এটি নতুন কোনো নীতি নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে তাদের নীতি হচ্ছে যথেচ্ছভাবে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং তার জন্য যে কোনো অজুহাত উপস্থাপন করা। যে দেশ তাদের সঙ্গে একমত না হয়, তার বিরুদ্ধে চাপ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

যেখানে ন্যায়বিচার থাকে না, সেখানে ধ্বংস অনিবার্য। এসব শক্তি শত শত শিশু ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। এটি কেমন যুদ্ধ, যেখানে শিশুদের স্কুলে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে এবং কোনো জবাবদিহিতা নেই?

ইসলাম তাওহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছে, এবং মুসলিম দেশগুলোর উচিত এ উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানো ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তারা যেন এই শক্তিধর দেশগুলোকে নিজেদের উপাস্য মনে না করে; অন্যথায় এসব দেশ ধীরে ধীরে সব মুসলিম দেশ ও তাদের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে: যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে হবে। এরপর যদি কোনো এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, তবে সবাই মিলে সেই সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। আর যখন সে ফিরে আসে, তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে তাদের মধ্যে পুনরায় মীমাংসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই নির্দেশনা শুধু বিশ্বশান্তির জন্যই নয়, মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মীমাংসার সময় ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে প্রকৃত সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধান করতে হবে। পাকিস্তান ও চীনসহ কয়েকটি দেশ মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছে; ইরান ও আরব দেশগুলোর উচিত এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো দোয়া করা–বিশেষ করে বরকতময় রমযান মাসে–শুধু নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং সমগ্র মুসলিম জাতি এবং বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করা।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা সাহেবজাদি আমতুল জামিল সাহেবা–এর স্মৃতিচারণ

সাইয়্যেদনা হযরত আকদাস আমীরুল মুমিনীন (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ) ৬ মার্চের জুমার খুতবায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা, মুহতারমা সাহেবজাদি আমতুল জামিল সাহেবা–র ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান করে তাঁর সৎগুণাবলি উল্লেখ করেছেন, যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

মুহতারমা সাহেবজাদি আমতুল জামিল সাহেবা, যিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন এবং নাসির মাহমুদ সিয়াল সাহেবের স্ত্রী ছিলেন, তিনি চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেবের পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি মোসিয়া ছিলেন। তিনি হযরত সাইয়্যেদা মারিয়াম বেগম সাহেবা, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর সহধর্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা।

১৯৫৫ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) নিজেই তাঁর নিকাহ পড়ান। সে সময় হুযুর অসুস্থ ছিলেন, তাই তিনি শুয়ে শুয়েই নিকাহ সম্পন্ন করেন এবং দোয়া করেন। এই নিকাহে কেবলমাত্র পরিবারের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। হুযুর বলেন, এই নিকাহের সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর উপর একটি বিশেষ ধরনের ভাবাবেগ বিরাজ করছিল। ১৯৫৬ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর চারজন সন্তান রয়েছে–একজন পুত্র এবং তিনজন কন্যা। পুত্র জায়ের মুস্তফা সাহেব, কন্যা ইয়াসমিন মালিক সাহেবা (কানাডায়), কন্যা সাদিয়া আহমদ সাহেবা (যুক্তরাজ্যে) এবং সোফিয়া আহমদ সাহেবা, যিনি সাহেবজাদা মির্জা সমদ আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী, যিনি রাবওয়ায় নাজির খিদমতে দরবেশান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মুকাররম নাসির মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব ওয়াকফে জীবন ছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন ফজল–এ–উমর রিসার্চ শুরু করেন, তখন তাঁকে গবেষণার কাজে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে জামাআত তাঁকে নিজস্ব কাজ করার অনুমতি দেয়।

হুযুর বলেন, মরহুমা অত্যন্ত দরিদ্রপরায়ণ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর কিছু হিসাবপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি কতটা দরিদ্রদের খেয়াল রাখতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর কিছু ঘটনা এবং তাঁর কিছু স্বপ্নও রয়েছে। তিনি ওয়াকফে জীবনদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন।

তিনি যখন সাত বছর বয়সী ছিলেন, তখন তাঁর মা হযরত সাইয়্যেদা মারিয়াম সিদ্দিকা সাহেবার ইন্তেকাল হয়। তিনি খুব কাঁদছিলেন, তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে "আম্মি আল্লাহ মিয়াঁর ঘরে চলে গেছেন।" তিনি আরও বলেন, "দেখো, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, তোমার দাদা (হযরত মসীহ মওউদ আ.) ইন্তেকাল করেছেন–তখন কি তোমার মা তাঁদের চেয়ে বড় ছিলেন?"এরপর তিনি আর কান্না করেননি।

সাহেবজাদি আমতুল জামিল সাহেবা মরহুমার প্রসঙ্গে আমীরুল মুমিনীন (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা) তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর কিছু স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করেন।

হুযুর বলেন, তিনি চাঁদা প্রদানে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। তিনি আগে থেকেই নিজের সম্পদের হিসাব করে রাখতেন। জামাআতের সদস্যদের জন্য নিয়মিত দোয়া করতেন; এমনকি যাদের জন্য দোয়া করতে হতো তাদের একটি তালিকাও নিজের কাছে রাখতেন।আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি মাগফিরাত ও রহমত দান করুন। আমীন।

জুমআর খুতবা

যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে অধিকার দিতেন যে, নির্জনতা ও জনসমাগম –এর মধ্যে তুমি কোনটি পছন্দ করো, তবে সেই পবিত্র সত্তার কসম, আমি নির্জনতাকেই বেছে নিতাম। আমাকে তো তারা টেনে–হিঁচড়ে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন। নির্জনতায় যে আনন্দ আমি পাই, তা আল্লাহ ছাড়া আর কে জানে! আমি প্রায় পঁচিশ বছর নির্জনে কাটিয়েছি এবং কখনো এক মুহূর্তের জন্যও খ্যাতির দরবারে বসার ইচ্ছা করিনি। মানুষের মাঝে বসতে আমার স্বভাবতই অনীহা ছিল, কিন্তু আদেশদাতার আদেশে বাধ্য হয়ে তা করতে হয়েছে। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

সবসময় মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত উপকার তখনই হয় যখন রমজানের পরও আমরা আল্লাহর প্রেম ও ইবাদতের মান বজায় রাখি, বরং তা আরও উন্নত করার চেষ্টা করি। তবেই আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারব।

আমি যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করব বা করে এসেছি, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি ও মূল্যায়নের জন্য সেগুলো সামনে রাখা এবং চেষ্টা করা যে, আমরা সেসব কথা ও আমলগুলোর ওপরও আমল করব, যা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ গোলামের ইবাদতের পদ্ধতি ছিল বা আল্লাহর সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক ছিল। শুধু যেন এমন না হয় যে আমরা এসব ঘটনা শুনে আনন্দ লাভ করি; বরং এগুলো আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত তাঁর সামনে দোয়া করা। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

(মুসলেহ মাওউদ দিবস)–এর জলসাগুলোও আজকাল জামাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এর মাধ্যমে ইতিহাস সম্পর্কেও জানা যায়। এমটিএ–তেও অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। সেগুলো থেকেও জানা যায়। এগুলো দেখা উচিত।

মানুষের সর্বদা নিজের পরিণতি কল্যাণকর হওয়ার জন্য এবং নিজের ঈমানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করে যেতে হবে এবং এ জন্য দোয়াও করতে হবে। বিশেষ করে রমজানে যে দোয়াগুলো করা হয়, তার মধ্যে এই দোয়াটিও প্রত্যেকের করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিণতি কল্যাণকর করুন এবং ঈমানে দৃঢ় রাখুন।

রাতের পাহারার সময় আমরা হযরত সাহেব (আ.)–এর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যেতাম এবং দেখতাম, তিনি নামাজেই মগ্ন আছেন। আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি কখন ঘুমাতেন!

হুজুর (আ.) তাহাজ্জুদের নামাজ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আদায় করতেন। এমনকি ছোট মসজিদের পাশের কক্ষ থেকেও তাঁর আওয়াজ শোনা যেত। তাঁর অভ্যাস ছিল "ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম"বারবার পুনরাবৃত্তি করা।

বর্তমানে আমরা রমজান মাস অতিক্রম করছি এবং কিছু না কিছু তাওফীক তাহাজ্জুদের জন্য পাওয়া যায়। যদি না–ও পাওয়া যায়, তবুও চেষ্টা করা উচিত। অবশ্যই মসজিদে তারাবীহ পড়ানো হয় এবং এটি দুর্বল, অসুস্থ বা এমন লোকদের জন্য বিকল্প, যারা ভোরে ঠিক সময়ে উঠতে পারে না বা বেশি সময় দিতে পারে না। কিন্তু এটি এমন বিকল্প নয় যা পুরো হক আদায় করতে পারে। মহানবী (সা.)–এর সুন্নত এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ গোলামের পদ্ধতি হলো রাতের বেলা উঠে তাহাজ্জুদ পড়া। সুতরাং তারাবীহ পড়া হয়ে থাকলেও চেষ্টা করা উচিত–দুই রাকাত বা চার রাকাত হলেও–তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়া।

হুজুর (আ.) সর্বদা অজু অবস্থায় থাকতেন। তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং অবিরাম "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজীম"পাঠ করতেন।

"হায়! আমরা তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলি আমি বর্ণনা করতে পারি না। তাঁর জীবন কোনো সাধারণ মানুষের জীবন ছিল না; বরং তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দা হন এবং দুনিয়ায় মাঝে মাঝে আগমন করেন।" (সৈয়দ মীর হাসান সাহেব)

নামাজের সময় হলেই তিনি আদালতের কাজ ছেড়ে দিয়ে এবং অনুপস্থিতির ফলে যে ক্ষতি হতো তার কোনো পরোয়া না করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২০ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে গতকাল থেকে রমযান মাস আরম্ভ হয়েছে। রোযার এই মাসটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই মাস থেকে সর্বাধিক কল্যাণ লাভের তৌফিক দিন। কিন্তু সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্র কৃত কল্যাণ তবেই অর্জিত হবে যদি রমযানের পরও আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও ইবাদতের মান বজায় রাখি, বরং তা আরো উন্নত করার চেষ্টা করি; তবেই আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও পূর্ণকারী হতে পারব।

আপনারা জানেন, আমি বিগত কয়েক জুমুআ থেকে মহানবী (সা.)–এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা, ইবাদতের রীতি ও মান এবং মু'মিনদেরকে এর ওপর আমল করার জন্য তিনি যে উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন– সে সম্পর্কে বর্ণনা করে আসছি। আর এরপর তাঁর (সা.) একনিষ্ঠ দাস [মসীহ্ মওউদ (আ.)]–এর মহানবী (সা.)–এর সর্বোত্তম আদর্শের প্রকৃত অনুসরণের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছিলাম। এই বিষয়টি এখনও চলমান আছে এবং আজ রমযানের প্রেক্ষাপটেও এটিই চলমান থাকবে।

আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর পুণ্যময় জীবনচরিত থেকে এই বিষয়েই কিছু ঘটনা বর্ণনা করব, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং দোয়ার প্রতি তাঁর মনোযোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এটিও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, মনিব ও দাসের ইবাদত এবং ঐশী ভালোবাসার এসব ঘটনার বর্ণনায় তিনি আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যে, আমরা রমযান মাসে প্রবেশ করেছি।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তে আত্মপর্যালোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি এবং পেতে পারি। সুতরাং আমি যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করব বা করে আসছি, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আত্মপর্যালোচনার জন্য সেগুলোকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা। সেইসাথে আমাদের সর্বদা সেই সব কথা ও কর্ম অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত যেগুলো আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের (আ.) ইবাদতের পদ্ধতি ছিল বা আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। এমন যেন না হয় যে, আমরা কেবল এই ঘটনাগুলো শুনব এবং আনন্দিত হব; বরং এগুলো আমাদের জন্য পথনির্দেশক হওয়া উচিত।

ঘটনাবলির মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের একটি রেওয়ায়েত বা বর্ণনা উপস্থাপন করছি। তিনি মুকাররম মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বাটালভী সাহেবের একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জানান, এটি সম্ভবত ১৯০৭ সালের কথা, একবার মরহুম কাজী জিয়াউদ্দীন সাহেবের কন্যা আমাতুর রহমান সাহেবা, যিনি সম্পর্কে আমার নানাবাড়ির আত্মীয়াও ছিলেন, তিনি আমাকে কাগজের একটি টুকরো দেন, যা জঞ্জাল বা ফেলনা কাগজের মতো ছিল। কিন্তু যেহেতু এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন-এর নিজ হাতে লেখা বাক্য ছিল, তাই আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা হস্তগত করি এবং সংরক্ষণ করি। এরপর তিনি বলেন, কোনো এক সময় এটি আমার হাত থেকে এদিক-সেদিক হয়ে যায় বা কোনো বইয়ের ভেতর রয়ে যায়। কিন্তু যা-ই হোক, যেহেতু এর সাথে একটি ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে যা আমাতুর রহমান সাহেবা নিজে আমাকে শুনিয়েছিলেন, তাই ওই কাগজের টুকরোতে- যা দৃশ্যত একটি ফেলনা কাগজ ছিল- যাতে অকৃত্রিমভাবে লেখা সেই বাক্যের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং ইবাদতের প্রতি অনুরাগের স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, এ কারণেই আমি এর উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি। আমাতুর রহমান সাহেবা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়িতে থাকতেন তখন তিনি দেখেছিলেন এবং তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন- দেখা যাক, চোখ বন্ধ করে কাগজের ওপর লেখা যায় কি না। নিজেদের মধ্যকার ঘরোয়া পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এই পরীক্ষা চলছে। সুতরাং কাগজের সেই টুকরোটি হাতে নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ওপর এই বাক্যটি লেখেন, যা আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। যদিও কাগজটি হারিয়ে গেছে, কিন্তু আমার তা স্মরণ আছে এবং আমি অত্যন্ত দৃঢ় আস্থার সাথে বলতে পারি, যদি কখনো সেটি পাওয়াও যায়- এ বাক্যই তাতে লেখা থাকবে। হুযূর (আ.) চোখ বন্ধ অবস্থায় যা লিখেছিলেন তা হলো, 'মানুষের উচিত সর্বক্ষণ খোদা তা'লাকে ভয় করা এবং পাঁচবেলা তাঁর দরবারে দোয়া করতে থাকা।'

সুতরাং, এটিই হলো সেই মান, যা তিনি (আ.) সর্বদা তাঁর অনুসারীদেরকে অর্জন করার শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বদা তাঁর (আ.) কেবল এই চিন্তাই থাকত যে, আমার অনুসারীরা, বরং প্র ত্যেক মু'মিন যেন এমন হয় যার মাঝে খোদাভীতি বিদ্যমান এবং সে সর্বদা ইবাদতের প্র তি মনোযোগ নিবন্ধকারী হয়। যাইহোক, ওই কাগজের ওপর হযরত আম্মাজানেরও যে লেখা ছিল, আমি সেটিও বর্ণনা করে দিচ্ছি, যা সাধারণ ঘরোয়া বিষয় সম্পর্কিত ছিল। হযরত আম্মাজানের সরল বাক্যটি ছিল, 'মাহমুদ আমার আদরের ছেলে, কেউ যেন তাকে কিছু না বলে।' আর এরপর সন্তানদের সম্পর্কেই আরেকটি বাক্য ছিল যে, 'মুবারক আহমদ বিস্কুট চায়।' তো যা-ই হোক, এগুলোই ছিল দুইজনের লেখা। এগুলো সাধারণ ঘরোয়া কথা ছিল যা তিনি লিখেছিলেন।তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা যদিও ভাঙাভাঙা ছিল, কিন্তু তা স্পষ্ট ছিল। যদিও চোখ বন্ধ করে তা লেখা হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন টেনে টেনে লেখা হয়েছে, কিন্তু তা স্পষ্ট ছিল এবং তা পাঠোদ্ধার সম্ভব ছিল। চোখ বন্ধ করে লেখা সত্ত্বেও, অন্যান্য লেখার মতোই এর লাইনগুলো সোজা ছিল; যেভাবে সাধারণ লেখায় মানুষ সোজা লাইনে লেখে- তা ঠিক ছিল, একেবারে সোজা লাইন ছিল। কিন্তু হযরত উম্মুল মু'মিনীনের অক্ষরগুলো ওপর-নীচ হয়ে গিয়েছিল এবং লাইনও সোজা থাকে নি। লেখাটি কী ছিল তা তো জানা গেল। যে বিশেষ কথাটি যা সর্বদা আনন্দিত করে আর এটি সত্যিই আনন্দের বিষয় যে, নিজ ঘরে অত্যন্ত অকৃত্রিম পরিবেশে বসে থাকা অবস্থাতেও যদি হঠাৎ না ভেবেচিন্তে হুযূর (আ.)-কে কোনো কথা লিখতে হয়, তবে তা উপদেশমূলক বাক্য ছাড়া আর কিছুই তাঁর মনে আসে নি। অন্যদিকে হযরত উম্মুল মু'মিনীনের লেখাটি এমন ছিল, যা সেই পরিবেশ অনুযায়ী তাঁর মনে আসা স্বাভাবিক ছিল। এরপর তিনি যা লিখেছেন তা ছিল এক বাস্তব সত্য। তিনি লেখেন, এটিই হলো সেই পার্থক্য যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ মানুষের মাঝে হয়ে থাকে। তাঁর (আ.) হৃদয়ে এই ব্যাকুলতা ছিল যে, কীভাবে মানুষকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করা যায় এবং তাদের মাঝে ইবাদতের স্পৃহা জাগ্রত করা যায়।

(সীরাতুল মাহদী,২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮-১৪৯)

বস্তুত এটি ঘরোয়া পরিবেশের একটি অত্যন্ত সাদামাটা ঘটনা, কিন্তু এর মাঝে অনেক গভীর শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৮৪ সালে ইচ্ছা পোষণ করেন যে, কাদিয়ান থেকে বাইরে কোথাও গিয়ে 'চিল্লা' বা 'নির্জন সাধনা' করবেন এবং ভারতবর্ষও ভ্রমণ করবেন। সুতরাং তিনি (আ.) গুরুদাসপুর জেলার সুজানপুরে গিয়ে নির্জনে থাকার সংকল্প করেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, এ বিষয়ে হুযূর (আ.) নিজের হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ড আমার কাছে পাঠান। তখন আমি নিবেদন করলাম, আমাকেও যেন এই সফরে এবং ভারতবর্ষের সফরে সাথে রাখা হয়। হুযূর (আ.) তা মঞ্জুর করেন। কিন্তু এরপর সুজানপুর সফরের বিষয়ে হুযূরের (আ.) প্র তি এলহাম হয়, 'তোমার সমস্যার সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে।' সুতরাং তিনি সুজানপুর যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং হুশিয়ারপুর যাবার সংকল্প করেন। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি (আ.) যখন হুশিয়ারপুর যাবার প্রস্তু তি নিচ্ছিলেন, তখন হুযূর (আ.) আমাকে [অর্থাৎ মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্‌কে] চিঠি লিখে কাদিয়ান যেতে বলেন। আর হুশিয়ারপুরের রঈস শেখ মেহের আলী সাহেবকে চিঠি লেখেন, আমি দুই মাসের জন্য হুশিয়ারপুর আসতে চাচ্ছি। শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত এমন কোনো একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, যেটি দ্বিতল হবে। [বাড়িটি যেন দোতলা হয় এবং শহরের বাইরে হয়।] শেখ মেহের আলী সাহেব নিজের একটি বাড়ি, যেটি 'তাভীলা' নামে সুপরিচিত ছিল, সেটি খালি করে দেন। হুযূর (আ.) ছোটো গরুর গাড়িতে বসে, বিপাশা নদীর পথ ধরে যাত্রা করেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, আমি, শেখ হামেদ আলী এবং ফতেহ্ খান সাহেব সাথে ছিলাম। ফতেহ্ খান, হুশিয়ারপুর জেলার টান্ডা সংলগ্ন রসূলপুরের বাসিন্দা ছিল এবং হুযূর (আ.)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, পরবর্তীতে সে মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর খপ্পরে পড়ে মুরতাদ হয়ে যায়। হুযূর (আ.) নদীর তীরে পৌঁছার পর নদী পার হবার জন্য নৌকা নেন; নৌকা যখন চলছিল তখন হুযূর (আ.) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্! কামিল (পুণ্যবান) ব্যক্তির সাহচর্য এই নদীভ্রমণের মতো, যা পার হবার আশা থাকে, আবার ডুবে যাবার আশঙ্কাও থাকে। [অর্থাৎ কামিল বা পুণ্যবান ব্যক্তি, বুযুর্গ বা ওলীউল্লাহ্‌র সাহচর্যে থাকা মানুষের পরিণতি উভয় প্রকার হতে পারে। হয়ত সে পারও হয়ে যেতে পারে, আবার যেমনটি আমরা নদীতে নৌকায় করে যাচ্ছি, এই নৌকা আমাদের নিমজ্জিতও করতে পারে।] তিনি বলেন, আমি হুযূর (আ.)-এর এই কথাটি (তখন) ভাসা ভাসা শুনেছিলাম, কিন্তু ফতেহ্ খান যখন মুরতাদ হয়ে যায় তখন আমার হযরত সাহেবের এই কথাটি মনে পড়ে। যাহোক, তিনি বলেন, আমরা পথিমধ্যে ফতেহ্ খানের গ্রামে যাত্রাবিরতি করে পরের দিন হুশিয়ারপুর পৌঁছি। সেখানে পৌঁছানোর পরপরই হযরত সাহেব (আ.) তাভীলার দোতলায় অবস্থান গ্রহণ করেন। আর আমাদের মাঝে যেন কোনো বিবাদ না হয়, সেজন্য আমাদের তিনজনের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। আমার দায়িত্ব ছিল রান্নাবান্নার। ফতেহ্ খানের দায়িত্ব ছিল বাজার থেকে সদাই ইত্যাদি নিয়ে আসা। শেখ হামেদ আলীর দায়িত্ব ছিল ঘরের দৈনন্দিন কাজগুলো করা আর আগন্তুকদের আতিথ্য করা। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাতে লেখা বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করেন, চল্লি শ দিন পর্যন্ত কেউ যেন আমার সাথে দেখা করতে না আসেন এবং কেউ যেন আমাকে নিমন্ত্রণ না করেন। এই চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পর আমি এখানে আরো কুড়ি দিন অবস্থান করব। এই বিশ দিনে যারা সাক্ষাৎ করতে চান তারা সাক্ষাৎ করতে পারবেন, যারা নিমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছা রাখেন তারা নিমন্ত্রণ করতে পারবেন এবং যারা প্র শ্নোত্তরের বাসনা রাখেন তারা প্রশ্নোত্তর করতে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

পারবেন।হযরত সাহেব (আ.) আমাদেরকেও নির্দেশ দেন, দেউড়ির (তথা সদর দরজার) ভেতরের শিকল যেন সর্বদা লাগানো থাকে, [অর্থাৎ দরজা যেন ভেতর থেকে আটকানো থাকে,] আর ঘরের ভেতরেও কেউ যেন আমাকে না ডাকে। আমি যদি কাউকে ডাকি, তবে সে যেন কেবল ততটুকুই আমার কথার উত্তর দেয় যতটুকু প্র য়োজন। দোতলায় কেউ যেন আমার কাছে না আসে। [ওপরের তলায় যেখানে তিনি (আ.) অবস্থান করছিলেন, সেখানে যেন অন্য কেউ না যায়।]তিনি বলেন, আমার দায়িত্ব ছিল তাঁর খাবার ওপরে পৌঁছে দেওয়া। আর তিনি (আ.) বলেছিলেন, আমার খাবার ওপরে পৌঁছে দেবে, কিন্তু আমার খাবার খাওয়ার জন্য যেন অপেক্ষা না করা হয়। খালি বাসনপত্র পরে অন্য কোনো সময়ে নিয়ে যেয়ো। আমি আমার নামায ওপরেই পড়ব, [কারণ আমি চিল্লা পালন করছি, তাই আমি ওপরেই নিজের নামায পড়ব;] আর তোমরা নীচে একত্রে পড়ে নিয়ো। জুমুআর জন্য তিনি (আ.) বলেন, জুমআ পড়া যেহেতু আবশ্যক, তাই কোনো নির্জন মসজিদ খুঁজে বের করো, যা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত হবে আর যেখানে আমরা পৃথকভাবে নামায পড়তে পারব। শহরের বাইরে একটি বাগান ছিল, সেখানে একটি ছোট্ট পরিত্যক্ত মসজিদ ছিল। জুমুআর দিন হুযূর (আ.) সেখানে যেতেন এবং আমাদেরকে নামায পড়াতেন আর খুতবাও তিনি নিজেই দিতেন।

মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করতেন, আমি খাবার রেখে আসার জন্য ওপরে যেতাম কিন্তু হুযূর (আ.)-এর সাথে কোনো কথা বলতাম না। তবে হুযূর (আ.) নিজে কখনও আমার সাথে কোনো কথা বললে (তার) উত্তর দিতাম মাত্র। একবার হযরত সাহেব (আ.) আমাকে বলেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্! এই দিনগুলোতে আমার প্রতি খোদা তা'লার কৃপার বড়ো বড়ো দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং কখনো কখনো দীর্ঘ সময় ধরে খোদা তা'লা আমার সাথে কথা বলা অব্যাহত রাখেন। যদি এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে তা অনেক পৃষ্ঠা হয়ে যাবে।মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, প্র তিশ্রুত পুত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন এলহামও এই চিল্লাতেই হয়েছিল এবং চিল্লা শেষ হবার পর হুশিয়ারপুর থেকেই তিনি (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। এটি ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের বিজ্ঞপ্তি, যা জামা'তে 'পেশগোয়ী মুসলেহ্ মওউদ' (বা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী) নামেও পরিচিত।

এটিও এক বিশেষ কাকতালীয় ব্যাপার, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি এবং প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হবার দিনও বটে।

সেই প্রতিশ্রুত পুত্র, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বায়ান্ন বছর যাবৎ তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু সাফল্যে ভূষিত করেছেন। মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যেসব কথা, এলহাম এবং প্রতিশ্রুতি ছিল- সেগুলো সবই হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-র সত্তায় পূর্ণ হয়েছিল। আর আমি এটিকে কাকতালীয় এ জন্য বলছি যে, এই ঘটনাটি আজকের দিনেই আমার সামনে এসেছে, নতুবা এটি আগে-পরেও আসতে পারত। কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে এটি আজকের দিনেই সামনে আসা এবং বর্ণনা করা নির্ধারিত ছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপটে, যা 'মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী' দিবস, এই ঘটনার পটভূমিও বর্ণিত হয়ে গেল যে, কীভাবে তিনি [হযরত মসীহ্ মসীহ্ (আ.) হুশিয়ারপুর] যান, চিল্লাকাশি করেন এবং সেখানে তাঁকে বিভিন্ন সুসংবাদ প্রদান করা হয়।

আজকাল জামা'তে এ উপলক্ষ্যে জলসাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে (জামা'তের) ইতিহাসও জানা যায়। এমটিএ-তে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলো থেকেও জানা যায়; সেগুলো দেখা উচিত।

যাইহোক, তিনি (রা.) বলেন, যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন তিনি (আ.) ঘোষণা অনুযায়ী আরো বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই দিনগুলোতে অনেক মানুষ (তাঁকে) নিমন্ত্রণ করেন, অনেকেই ধর্মীয় মতবিনিময়ের জন্য আসেন এবং বাইরে থেকে হুযূর (আ.)-এর পূর্বপরিচিত লোকজনও অতিথি হিসেবে আসেন। এই দিনগুলোতেই মুরলিধরের সাথে তাঁর (আ.) মুবাহাসা (বা ধর্মীয় বিতর্ক) অনুষ্ঠিত হয়, যা 'সুরমা চশমায়ে আরিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

দুই মাসের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর হযরত সাহেব (আ.) পুনরায় সেই পথে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।হুশিয়ারপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একজন বুযুর্গের সমাধি অবস্থিত। [এখানে সফরকালীন আরো একটি ঘটনাও লেখা হয়েছে।] সেখানে একটি ছোটো বাগান রয়েছে। সেখানে পৌঁছে হুযূর (আ.) কিছুক্ষণের জন্য গরুর গাড়ি থেকে নীচে নেমে আসেন এবং বলেন, এটি চমৎকার ছায়াযুক্ত স্থান, এখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করা যাক। এরপর হুযূর (আ.) কবরের দিকে যান আর কথিত আছে, এটি কোনো বুযুর্গের সমাধি। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, আমিও তাঁর পেছনে পেছনে যাই আর শেখ হামেদ আলী এবং ফতেহ্ খান গরুর গাড়ির কাছেই থেকে যায়। তিনি (আ.) সমাধির কাছে পৌঁছে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে দোয়ার জন্য হাত তোলেন এবং কিছুক্ষণ দোয়া করতে থাকেন। তারপর ফিরে এসে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি যখন দোয়ার জন্য হাত তুলি, তখন এই কবরে সমাহিত বুযুর্গ বের হয়ে আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসেন। আর তুমি যদি সাথে না থাকতে, তাহলে আমি তাঁর সাথে কথাও বলতাম। তাঁর চোখগুলো বড়ো বড়ো এবং (গায়ের) রং শ্যামলা।এরপর তিনি (আ.) বলেন, দেখো, এখানে যদি কোনো খাদেম থাকে তাহলে তার কাছে এঁর অর্থাৎ এই বুযুর্গের বিষয়ে জিজ্ঞেস করো। বস্তুত হুযূর (আ.) খাদেমকে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, আমি নিজে তাঁকে দেখি নি, কারণ তাঁর ইন্তে কালের প্রায় একশ বছর পার হয়ে গেছে। তবে আমার পিতৃপুরুষের কাছে শুনেছি, তিনি অত্রাঞ্চলের প্রথিতযশা বুযুর্গ ছিলেন এবং এ অঞ্চলে তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করেন, তাঁর শারীরিক গড়ন কেমন ছিল? সে বলে, শুনেছি যে তাঁর গায়ের রং শ্যামলা ছিল এবং বড়ো বড়ো চোখ ছিল। তারপর আমরা সেখান থেকে যাত্রা করে কাদিয়ান পৌঁছি। সে হুবহু সেই দৈহিক অবয়বই বর্ণনা করে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছিলেন যে, সেই বুযুর্গ (তাঁর) সামনে এসে বসেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকে, মৃতদের সাথে বাক্যালাপ হয়; কিছু পুণ্যবান লোকদের, আউলিয়াদের, নবীদের সাথে এভাবেই কথা হয়ে থাকে, কারো কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। এগুলো আল্লাহ্ তা'লার নিজস্ব পদ্ধতি। যাইহোক, এই সফর সমাপ্ত হয় এবং তারা কাদিয়ান পৌঁছান।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, আমি এই সফরের ব্যাপারে মিয়াঁ আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করি যে, হযরত সাহেব এই নিভৃতবাসের যুগে কী করতেন এবং কীভাবে ইবাদত করতেন? হযরত মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ (রা.) উত্তর দেন, এটি আমরা জানি না। কারণ তিনি ওপর তলার কক্ষে অবস্থান করতেন আর আমাদের সেখানে যাবার অনুমতি ছিল না। খাবার প্রভৃতির জন্য আমরা উপরে গেলে অনুমতি নিয়ে যেতাম। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন খাবার রাখার জন্য ওপরে গেলে হযরত সাহেব (আ.) আমাকে বলেন, আমার প্রতি এলহাম হয়েছে, 'বুরিকা মান ফিহা ওয়া মান হাওলাহা'। হুযূর (আ.) ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মান ফিহা' অর্থ আমি, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.); আর 'মান হাওলাহা' অর্থ তোমরা যারা আমার সাথে আছো। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করতেন, আমি তো সারাদিন ঘরেই থাকতাম, শুধু জুমুআর দিন হুযূর (আ.)-এর সাথে বাহিরে যেতাম। শেখ হামেদ আলীও (রা.) অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকত। কিন্তু ফতেহ্ খান প্রায় সময় বাহিরে থাকত। আর সম্ভবত এই ইলহামের সময় সে বাহিরে ছিল। এটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের (রা.) ধারণা। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সে দিনগুলোতে ফতেহ্ খান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এতটা ভক্ত ছিল যে, আমাদের সাথে কথা বলার সময় সে বলত, হযরত সাহেবকে আমি নবী মনে করি। আর আমি (মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্) এই কথায় পুরানো বিশ্বাস অনুযায়ী অস্বস্তি বোধ করতাম যে, নবী কীভাবে আসতে পারে? এখন তো নবী আসতে পারে না। কিন্তু ফতেহ্ খান সে সময় তাঁর এতটা ভক্ত ছিল যে, তাঁকে নবী সে সময়ও বলত যখন তিনি (আ.) বয়আতও গ্রহণ করেন নি, কোনো ধরনের দাবিও করেন নি; তিন-চার বছর পূর্বের ঘটনা। কিন্তু যখন সে হোঁচট খেল, মুরতাদ হয়ে গেল। সুতরাং এজন্য সর্বদা মানুষের উচিত নিজের শুভ পরিণামের জন্য (ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা) দোয়া করা এবং নিজের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর সেজন্য দোয়াও করতে থাকা উচিত। বিশেষভাবে রমযানে যে দোয়াসমূহ করা হয় তাতে সবার এই দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিণাম শুভ করুন, ঈমান দৃঢ় রাখুন।

মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) এটিও বলেছেন, একবার আমি খাবার রাখতে গেলে হুযূর (আ.) বলেন, আমাকে খোদা তা'লা এমনভাবে সম্বোধন করেন এবং আমার সাথে এমনভাবে কথা বলেন যে, যদি আমি তার কিছু অংশও প্র কাশ করি, তাহলে যত ভক্ত-অনুরাগী দেখা যাচ্ছে তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবে; আর কার্যত এমনটাই হয়েছে। যখন তিনি (আ.) দাবি করলেন তখন কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, চরম বিরোধিতা আরম্ভ করে দিয়েছে। কেননা তারা চিন্তাও করতে পারে নি যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে কথা বলতে পারেন।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬২-৬৫)

একইভাবে নামায পড়ার ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে। কিছু লোক নামাযের ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করেন, কীভাবে হাত বাঁধা উচিত আর নামাযের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইবাদত কীভাবে করতেন, নামায কীভাবে পড়তেন- এই ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে। মিয়াঁ আলী মুহাম্মদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি হুযূরকে সুন্নত নামায পড়তে দেখলাম। ফরযের পূর্বে তিনি (আ.) সুন্নত পড়ছিলেন। হুযূর (আ.) হাত নাভির ওপর বেঁধেছিলেন এবং ডান হাতের মধ্যমা কনুই পর্য ন্ত পৌঁছিয়েছিলেন; বরং কিছুটা পেছনে ছিল। সিজদা করার সময় তাঁর দুই হাতের মাঝে কপাল ও নাক মাটিতে রাখতেন। আঙুলগুলো সোজা কা'বার দিকে হতো, হাত এভাবে সোজা থাকত। তিনি (আ.) যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন তাঁর (আ.) পাগড়ি কিছুটা ঢিলা হয়ে পিছনে সরে গেলে আঙুল দিয়ে তা ঠিক করে নিতেন। যাইহোক, তিনি এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুন্নত নামায মসজিদ আকসায় তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কবরের দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে আদায় করেন। আর এরপর ফরয নামায আরম্ভ হয় যা হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) পড়ান।

(আসহবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩)

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ জামিল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, প্লেগের মহামারি দেখা দেওয়ার প্রারম্ভিক দিনগুলোতে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিবার -পরিজনসহ বাগানে স্থানান্তরিত হয়ে যান, আমরা তখন রাতের বেলা পাহারা দিতাম। আর প্লেগের সময় উন্মুক্ত স্থানে বসবাস করাকেই সমীচীন মনে করা হতো, তাই তিনি (আ.) সেখানে চলে গিয়েছিলেন। রাতে

পাহারার সময় আমরা হযরত সাহেবের তাঁবু অতিক্রম করার সময় দেখতাম হুযূর (আ.) নামাযেই মগ্ন রয়েছেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন তিনি (আ.) কখন ঘুমাতেন! (আসহবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৮)

অনুরূপভাবে হযরত চৌধুরী ভাই আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (আ.) তাহাজ্জুদের নামায অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে আদায় করতেন। এমনকি ছোটো মসজিদের সম্মুখের কক্ষ থেকেও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যেত। হুযূর (আ.)-এর রীতি ছিল, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম' আয়াতটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতেন। (আসহবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৬

অতএব এই দোয়া আমাদেরও বার বার পুনরাবৃত্তি করা উচিত যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

হযরত মাস্টার নযীর হোসাইন সাহেব (রা.) তাঁর (আ.) তাহাজ্জুদ নামাযের ভাবগাম্ভীর্যের চিত্র তুলে ধরে বলেন, একবার জেহলাম যাবার সময় আমরা লাহোরে আমার দাদা হযরত মিয়াঁ জালালুদ্দীন সাহেব (রা.) মরহুমের বাড়ি 'মুবারক মঞ্জিল'-এ অবস্থান করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রাতে সেখানেই অবস্থান করেন। একটি কক্ষে হুযূর (আ.)-এর ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বলেন, আমিও সেই কক্ষের বাহিরে বারান্দায় দরজার পাশে শুয়ে পড়ি। রাত প্রায় তিনটায় যখন আমি জাগ্রত হই আর কক্ষের ভেতর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখি তখন তিনি (আ.) নামায পড়ছিলেন। আমিও ওযু করে হুযূর (আ.)-এর পিছনে কিছুটা দূরে নামায পড়া শুরু করি আর আমি হুযূর (আ.) যতটা দীর্ঘ কিয়াম, রুকু বা সিজদা করছেন ততটা দীর্ঘ কিয়াম, রুকু বা সিজদা করার অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু তা করতে সক্ষম হই নি। মাত্র দুই রাকআতেই আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অথচ হুযূর (আ.) তখনও সেই রাকআতেই ছিলেন যে রাকআতে আমি যুক্ত হয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি যে রাকআতে হুযূর (আ.)-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলাম তিনি (আ.) সেই রাকআতে কিয়ামেই ছিলেন। তিনি বলেন, অথচ আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তিনি বলেন, আমি (তাঁর অনুসরণে) নামায পড়া বাদ দিয়ে নিজের মতো করে নামায পড়া আরম্ভ করি। এটি ছিল তাঁর মনিব [রসূলুল্লাহ্ (সা.)]-এর অনুসরণে তাঁর ইবাদতের এক ঝলক, আর এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করা চেষ্টা। তিনি বলেন, দিনের বেলা যখন আমরা হুযূর (আ.)-এর পাশে বসে ছিলাম আর তিনি (আ.) জামা'তকে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব বুঝাচ্ছিলেন তখন খাকসার জিজ্ঞেস করি, কেউ যদি তাহাজ্জুদ নামায পড়তে না পারে তাহলে কমপক্ষে কী করা উচিত? অনেকেই জিজ্ঞেস করে থাকেন, তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে কী করা যায়? হুযূর (আ.) বলেন, তখন অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার, আল্লাহ্র গুণকীর্তন ও প্রশংসা (তসবীহ ও তাহমীদ) করা উচিত; এতে করে পরবর্তীতে তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য হবে।

তবে এসব দোয়া যেগুলো তিনি (আ.) শিখিয়েছেন- এগুলো তাহাজ্জুদের বিকল্প নয়, বরং এতে তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য লাভ হবে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও (রা.) লিখেছেন, [সম্ভবত এটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবেরই বর্ণনা;] আমার যখন তাহাজ্জুদে অবহেলা হয় তখন আমি [অথবা বর্ণনাকারী] তা অনুসরণ করি আর এতে আমি তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি। (আসহবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৮

সুতরাং এটি এমন এক ব্যবস্থাপত্র যা অলসতার দিনগুলোতে আমাদের অবলম্বন করা উচিত।

আজকাল আমরা রমযান মাস অতিক্রম করছি আর এতে কিছু না কিছু তাহাজ্জুদ আদায়ের সৌভাগ্য লাভ হয়। যদি না-ও হয়, তবুও চেষ্টা করা উচিত। যদিও মসজিদে তারাবীহ পড়ানো হয় এবং এটি বিকল্প হিসেবে হয়, দুর্বল ও অসুস্থদের জন্য বা এমন লোকদের জন্য যারা ভোরে (তাহাজ্জুদের) সঠিক সময়ে উঠতে পারে না অথবা বেশি সময় দিতে পারে না; কিন্তু এটি এমন বিকল্প নয় যা (তাহাজ্জুদের) পূর্ণ অধিকার আদায় করতে পারে।

মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের পদ্ধতি হলো, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া। সুতরাং তারাবীহ পড়লেও দুই রাকআত বা চার রাকআত হলেও তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়া উচিত।

এভাবেই হযরত খায়রুদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসন্ত কালে সকাল প্রায় আটটার সময় কাদিয়ান থেকে প্রাতঃভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হন, সেই পথে যা মেনি ও কাদেরাবাদের মাঝখানে অবস্থিত এবং যাকে সড়কও বলা হয়। তিনি (আ.) কাদিয়ানের শেষ সীমানায় দুই রাকআত নফল নামায পড়েন এবং তারপর আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে হেঁটে কাদিয়ানে ফিরে যান। (আসহবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯০) অর্থাৎ প্রাতঃভ্রমনেও তাঁর ইবাদতের খেয়াল ছিল।

কাদিয়ানে বসবাসকারীদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এর পবিত্রতার খেয়াল রাখা এবং এই জনপদে বসবাদের দায়িত্ব পালন করা, নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা। কেননা তিনি (আ.) তো কাদিয়ানের ভেতরেও এবং প্রান্তেও নফল ও নামায পড়েছেন।

হযরত মালেক নিয়াজ মুহাম্মদ সাহেব বলেন, ১৯০৪ সালে যখন আমি কাদিয়ান গেলাম, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করম দীনের মামলা চলাকালে গুরদাসপুর যাতায়াত করতেন। যখন আমিও সেখানে গেলাম, তখন পুকুরের ধারে একটি ঘরে হুযূর অবস্থান করেন এবং জামা'তের সদস্যরাও সেখানে অবস্থান করতেন; লঙ্গরখানাও সেই অংশেই চালু ছিল। আদালতে আমি দেখলাম, হুযূরের জন্য একটি চাটাই বিছানো হতো এবং হুযূর তাতে বসতেন আর অন্যান্য সদস্যরাও তাতে বসতেন। একটি বড়ো চাটাই ছিল। একটি বিষয় আমি লক্ষ করেছি যা বিশেষভাবে স্মরণ আছে, হুযূরের সর্বদা ওযু করা অবস্থায় থাকার ব্যাপারে। হুযূর যখনই পেশাব ইত্যাদির জন্য যেতেন, তার পরে অবশ্যই ওযু করে নিতেন, যার ফলে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, হুযূর (আ.) সর্বদা ওযু করা অবস্থায় থাকতেন। তিনি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম' অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে অবিরত পড়তে থাকতেন।

(আসহবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭)

হযরত চৌধুরী ভাই আবদুর রহীম সাহেব বর্ণনা করেন,

"প্রাথমিক দিনগুলোতে হুযূরের রুটিন ছিল, হুযূর নামাযে সাধারণত সবার আগে মসজিদে উপস্থিত হতেন।"(আসহবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৬

একবার আমি সবার আগে পৌঁছার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হুযূর সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। হুযূর আকদাস তাঁর যৌবনের একটি অংশ সিয়ালকোটে কাটিয়েছেন যা কমবেশি সাত বছর দীর্ঘ হবে। সেখানে তাঁর যে দিনরাত কেটেছে, তাতে আল্লাহ্ র প্রতি ভালোবাসা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর যে-ই বর্ণনা করেছে, সে হুযূরের নির্ভৃত কোণে নির্জনে সময় কাটানো এবং নামায ও তিলাওয়াতে গভীর মনোনিবেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। এই প্রসঙ্গে সিয়ালকোটের কয়েকজন এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যও আমি উপস্থাপন করছি

যারা বিশ্বস্ত ও বুযুর্গ গণ্য হন। হাকিম বদর হুসাইন সাহেব লিখেছেন, এটি তাঁর সাক্ষ্য; যদিও তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্র ত্যাদিষ্ট হবার দাবির পর আহমদীয়াতের শত্রুদের প্রথম সারিতে চলে গিয়েছিলেন এবং উপন্যাসের আদলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু ঘটনার ওপর বিদ্বেষপূর্ণ আপত্তিও করেছিলেন; তবে হুযূরের সিয়ালকোট অবস্থানকালের পবিত্র স্মৃতিকে বিরোধিতা সত্ত্বেও ভুলতে পারেন নি। তিনি লেখেন, অত্যন্ত সৌম্যদর্শন [অর্থাৎ মর্যাদাবান চেহারা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পরম ধৈর্য ও উচ্চ চিন্তার অধিকারী মানুষ, নিজের গগনচুম্বী মনোবলের বিপরীতে কারো হম্বিতম্বি কে কিছুই মনে করতেন না। ঘরে প্রবেশ করেই ওযুর জন্য পানি চাইলেন; [যেই ঘটনাটি বর্ণনাকারী বলছেন, সেই সময় যে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন- তার কথা বলছেন;] এবং ওযু শেষ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন। ওযীফা পাঠরত ছিলেন, অর্থাৎ এরপর যিকরে এলাহীতে রত হয়ে যান। (হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

আবার প্রসিদ্ধ মুসলিম নেতা মৌলভী জাফর আলী খান সাহেবের পিতা, 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী সিরাজুদ্দীন সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন, মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০ বা ১৮৬১ সালের কাছাকাছি সিয়ালকোট জেলায় মুহুরী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে এবং আমরা চাক্ষুস সাক্ষ্য দিতে পারি যে, যৌবনেও তিনি অত্যন্ত সৎ ও পরহেযগার বুযুর্গ ছিলেন। চাকরির কাজের পর তাঁর সমস্ত সময় ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়নে ব্যয় হতো এবং তিনি জনসাধারণের সাথে কম মেলামেশা করতেন। (হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

একবার হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সিয়ালকোটে সাইয়্যেদ মীর হাসান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যাঁর উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি। তিনি অশ্রুসজল নয়নে বলেন,

" পরিতাপ! আমরা তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করি নি; তাঁর মহান আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত বিষয়। তাঁর জীবন সাধারণ মানুষের জীবন ছিল না; বরং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দা হয়ে থাকেন এবং জগতে কখনো কখনো আগমন করেন।" (তারিখ আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭)

একটি এমন ঘটনাও আছে যা এক সাধারণ গ্রাম্য মানুষ কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নূর উপলব্ধি করেছিল তার সাথে সম্পর্ক রাখে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রেমিকদের ও মনোনীতদের চেহারা থেকে নূর ঝরে পড়ে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেছিলেন যে,

"একবার একটি মামলার জন্য আমি ডালহৌসি পাহাড়ে যাচ্ছিলাম, পথে বৃষ্টি শুরু হলো। আমি এবং আমার সঙ্গী এক্কা থেকে নেমে একটি পাহাড়ি মানুষের ঘরের দিকে গেলাম যা রাস্তার পাশে ছিল। আমার সঙ্গী এগিয়ে গিয়ে গৃহকর্তার কাছে ভেতরে আসার অনুমতি চাইল, কিন্তু সে বাধা দিল। ছোট্ট একটি ঘর হবে, গরিব লোকদের ঘর তো এমনই হয়। এতে তাদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল এবং গৃহকর্তা রেগে গিয়ে গালাগালি করতে লাগল। যখন সে (অর্থাৎ সাহাবী) বলে, আমি আসব, সে (তথা গৃহকর্তা) বলে, আমি আসতে দেবো না, তুই-তোকারি শুরু হয়ে গেল। হযরত সাহেব বলেন, আমি এই তর্ক শুনে এগিয়ে গেলাম, আর যেইমাত্র আমার ও গৃহকর্তার চোখাচোখি হলো, আমি কিছু বলার আগেই সে মাথা নীচু করে বলল, আসলে আমার একটি যুবতী মেয়ে আছে, তাই আমি অপরিচিত মানুষকে ঘরে ঢুকতে দিই না; তবে আপনি ভেতরে আসতে পারেন।হযরত সাহেব বলতেন, সে এক অপরিচিত মানুষ ছিল; আমিও তাকে চিনতাম না, সেও আমাকে চিনত না।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬)

সুতরাং এটি প্র কৃতপক্ষে খোদায়ী নূর, পবিত্রতা ও ইবাদতের চিহ্ন ছিল, যা তাঁর চেহারায় সেও দেখতে পেয়েছিল, আর সে বলে, ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সর্বদা তাঁর (আ.) সামনে থাকত। কোনো ব্যস্ত তা বা কর্মব্যস্ততা তাঁকে যিকরে এলাহীর বিষয়ে তাকে উদাসীন করতে পারে নি।

সুতরাং মামলাগুলোতেও আমরা এই আদর্শই দেখেছি; [আমি পূর্বে এমন ঘটনা বর্ণ নাও করেছি;] এমন সংবেদনশীল সময়ে যখন মামলা পেশ হচ্ছে, তখন নামাযকে গুরুত্ব দেওয়া ও নামায পড়া একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে এমন খোদানির্ভর ও নির্লিপ্ত ছিলেন যে, মামলা আদালতে পেশ হয়েছে, যে -কোনো মুহূর্তে হাজিরার ডাক পড়তে পারে, পিয়ন যে-কোনো সময় ডাকতে পারে; কিন্তু নামাযের সময় হতেই তিনি আদালতের ডাক ছেড়ে এবং অনুপস্থিতির পরিণাম সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে ঐশী আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতেন। (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪)

এটাই সেই আসল বিষয় যা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত; অর্থাৎ নামাযের সময় নামাযকে যে-কোনো অবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি সেই আদর্শ, যা একজন মু'মিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তিনি তাঁর মনিব থেকে এটি শিখেছেন এবং এর ওপর আমল করেছেন এবং আমাদের সামনে এই আদর্শ রেখেছেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁর এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, মামলা-মোকদ্দমার এই ধারা অনেক দীর্ঘ ছিল এবং কিছু মামলার অনুসরণ তাঁকে চিফ কোর্ট পর্য ন্ত করতে হতো। তিনি লেখেন, আমি এই জীবনচরিতের পাঠকদের হযরত মির্যা সাহেবের জীবনের এই অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে যে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, তাঁর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক। যারা হযরত সাহেবের সাহচর্যে থাকার এবং তাঁর কথা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, অথবা যারা তাঁর প্রকাশিত ভাষণসমূহ পড়েছেন, তারা জানেন যে, হযরত মির্যা সাহেব সর্বদা 'দস্ত বা-কার ও দিল বা-ইয়ার' অর্থাৎ হাত কাজে এবং হৃদয় প্রিয় বন্ধু আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন- এরই শিক্ষা তিনি দিতেন। মামলায় সাধারণত দেখা যায় যে, বাদী বা বিবাদী উভয়েই অস্থি রতা ও অশান্তি র অবস্থায় থাকে; কিন্তু মির্যা সাহেব যখন মামলার শুনানিতে যেতেন তখন তাঁর মাঝে কোনো অস্থি রতা বা ব্যাকুলতা দেখা যেত না। পূর্ণ স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে 'দিল বা-ইয়ার' হয়ে থাকতেন।যেখানে এসব মামলা তদারকি ছিল কেবল পিতার আনুগত্যের দায়িত্ব আদায়ের জন্য, সেখানে তিনি এসব মামলার সময় কখনো নামায কাযা করেন নি এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব গুলো পালনে উদাসীন হন নি। খোদ আদালতেই নামাযের সময় এমনভাবে মশগুল হয়ে যেতেন যেন তাঁর আর কোনো কাজই নেই।

ঘটনাবলিও তিনি লিখেছেন যে, আদালত থেকে ডাক আসত, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত থাকতেন।

তারপর তিনি লেখেন, মামলার এই সফরগুলোতেও প্রতিটি মুহূর্ত যদি কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ থাকত, তবে তা ছিল সেই সত্তার প্রতি, যিনি মহান স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। উদীয়মান সূর্য, রাত্রির আকাশে জ্বলজ্বল করা চাঁদ -তারকা, বহমান ঝরনা ও জলপ্রপাত, সুউচ্চ পাহাড়, প্রবহমান পানি, হিল্লোলিত ক্ষেত-খামার, পাখির কূজন এবং মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের শব্দে তিনি একমাত্র সত্তারই প্রতিফলন দেখতেন এবং সেই আলোর উৎসের ঝলক দেখতেন, অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসে তাঁর মহিমার বিকাশ দেখতে পেতেন। চারদিকে সেই প্রিয়তম প্র কৃত অস্তিত্বেরই চেহারা দেখতেন। তিনি চাঁদ দেখে যদি অত্যন্ত ব্যাকুল হতেন তবে তা এজন্যই যে, তাতেও প্রিয়তমের সৌন্দর্যের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যেত। সূর্যের প্রস্রবণে তাঁর তরঙ্গ দৃশ্যমান মনে হতো এবং প্রত্যেক তারকায় তাঁর ঔজ্জ্বল্যের ঝলক প্রতীয়মান হতো। সুদর্শন চেহারাসমূহে যে মাধুর্য লুকিয়ে আছে, তা সেই পরম স্র ষ্টারই সৌন্দর্যের পরিচয়াক। প্রত্যেক সুন্দর চোখ তাঁকেই দেখায় এবং প্রত্যেক বক্র কেশরাশি সেই এক আল্লাহ্‌র দিকেই ইশারা করে। প্রত্যেক ফুল ও কাননকে তাঁর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সুঘ্রাণ সুরভিত করে দেয়। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।সত্য কথা হলো, বাহ্যত তিনি এসব মামলার জন্য যাচ্ছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সফরগুলোতেও অন্য সবার চিন্তা ও সকল বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত থাকতেন। এই অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, যেমন আমি পূর্বে ডালহৌসি সফরের ঘটনা বর্ণনা করেছি, সেখানেও তিনি সড়কের দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, পানির ঝরনা ও পাহাড়ের সবুজের মেলা কত দৃষ্টিনন্দন!অতএব সেই এক সত্তায় বিলীনতার অবস্থা প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মাঝে বিরাজমান থাকত। দিন হোক বা রাত, নির্জন অবস্থা হোক বা জনসমক্ষে হোন- সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের স্মরণ কখনো হৃদয় থেকে মুছে যেত না। (হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৫-৮৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আম্মাজান আমাকে বলেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অথবা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছেন- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম' বেশি বেশি পড়া উচিত। আম্মাজান বলেন, এ কারণেই তিনি এটি অনেক বেশি পাঠ করতেন। এমনকি রাতে বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময়ও তাঁর জিহ্বায় এই যিকর জারি থাকত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি যখন মৌলভী শের আলী সাহেবের কাছে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করি তখন তিনি বলেন, আমিও দেখেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'সুবহানাল্লাহ্' খুব বেশি পড়তেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজের পর্যবেক্ষণও উল্লেখ করেছেন- আমি সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ করতে শুনেছি। তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে এবং কোমল স্বরে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন। মনে হতো, তিনি যেন পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করছিলেন।" (সীরাতুল মাহমদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩)

এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,

"পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব আমাকে বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘুমের অবস্থা এমন ছিল যে, কিছুক্ষণ পরপর তিনি জেগে উঠতেন এবং ক্ষীণস্বরে 'সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্' বলতে শুরু করতেন, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়তেন।" (সীরাতুল মাহমদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৭)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লিখেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রিয় মনিব ও নেতা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে নির্জনবাস ও একাকিত্ব খুব পছন্দ করতেন। যদি সম্ভব হতো তাহলে তিনি কখনো বাইরে বের হতেন না। বহুবার তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় একথা বলেছেন। সর্বোপরি তাঁর নিভৃতবাস, কোমল স্বভাব ও নির্জনপ্রিয় প্রকৃতির ওপর যখন গভীর প্রভাব পড়ে এবং তিনি ঐশী আকর্ষণে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আকৃষ্ট হন, তখন তিনি তাঁর পিতাকে একটি চিঠি লেখেন। এই পত্র পড়লে বোঝা যায়- তিনি শৈশব থেকেই দুনিয়ার প্রতি বিরাগ এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

যৌবনকালে লেখা এই চিঠি তাঁর পবিত্র স্বভাব ও নির্মল চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চিঠিটি ফার্সি ভাষায় লেখা। এর একটি অংশে তিনি পিতাকে সম্বোধন করে লিখেছেন, বর্তমান সময়ে আমি নিজ চোখে পরিষ্কারভাবে দেখছি, হৃদয়চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর কোনো না কোনো মহামারী দেখা দেয়, যা বন্ধুদেরকে বন্ধুদের থেকে এবং প্রিয়জনদেরকে প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমন কোনো বছর দেখি না, এই লেলিহান অগ্নি ও এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো কিয়ামতের ন্যায় ভয়াবহ পরিস্থি তি সৃষ্টি করে না। এই অবস্থাগুলো দেখে আমার হৃদয় দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ভয়ে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। [বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিও আমাদেরকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়- চারদিকে ভয়ানক আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার সাথে আরো বেশি সম্পর্ক স্থাপন করা।] তিনি এ চিঠিতে আরো লিখেছেন, প্রায়ই শেখ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী শিরাযীর এই দুটি পঙ্‌ক্তি স্মরণে আসে আর কষ্টে ও বেদনায় অশ্রু প্রবাহিত হয়-

মাকুন তাকিয়া বার উমরে নাপায়েদার/ মাবাশ আইমান আয বাযিয়ে রোযগার

অর্থাৎ- অস্থায়ী জীবনের ওপর ভরসা কোরো না, পৃথিবীর এই খেলায় নিজেকে কখনো নিরাপদ মনে কোরো না।

এটা মনে কোরো না যে, আমরা জাগতিকতায় মত্ত, তাই নিরাপদ হয়ে গেছি। সেই সময় তিনি 'ফররুখ কাদিয়ানী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। এরপর তিনি লিখেছেন, ফররুখ কাদিয়ানীর এই দুটি পঙ্‌ক্তিও হৃদয়ের ক্ষতে যেন লবণ ছিটিয়ে দেয়- বাদুনিয়ায়ে দুঁ দিল মাবান্দ অ্যায় নওজাওয়াঁ/ কেহ্ ওয়াকতে আজল মী রাসাদ না গাহাঁ

হে যুবক! এই ঘৃণ্য পৃথিবীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ো না, কারণ মৃত্যুর মুহূর্ত আচমকাই আঘাত হানে। আমি আমার বাকি জীবনটা নিভৃত কোণে কাটিয়ে দিতে চাই। মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পবিত্র খোদার স্মরণে নিমগ্ন হতে চাই, যেন পূর্ববর্তী ভুলত্রুটিসমূহের সুরাহা করা সম্ভব হয়।

এই দীর্ঘ পত্রটি থেকে বোঝা যায়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (জাগতিক) খ্যাতি ও মর্যদার প্রতি লালায়িত ছিলেন না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর

(এরপর শেষের পাতায়....)

যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum and Family, Bhagbangola, (MSD)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন-ঐশ্বর্য দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাদের পার্থিব উন্নতি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যেও না। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

ওয়াক্‌ফে নও শিশুদের সঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ ।অল খামিস (আই.)-এর ক্লাস

প্রোগ্রাম অনুযায়ী, সকাল এগারোটায় হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) মসজিদ বাইতুল হুদা-তে আগমন করেন এবং ওয়াক্?ফে নও শিশুদের সঙ্গে ক্লাস শুরু হয়।

ক্লাসটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা প্রিয় ফারহাদ আহমদ মোনিস উপস্থাপন করেন এবং এর উর্দু অনুবাদ প্রিয় রুস্তাগার আহমদ চৌহান পেশ করেন।

এরপর প্রিয় জীশান আহমদ আরিফ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নলিখিত মুবারক হাদিস পেশ করেন:

"তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো এবং তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দাও।"

(ইবনে মাজাহ, আদব অধ্যায়, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গ)

এরপর প্রিয় জাইন খান হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর নিম্নলিখিত উদ্‌ধৃতি পেশ করেন:

"যখন মানুষ আল্লাহ তাআলার হয়ে যায় এবং সমস্ত আরাম ও আনন্দ একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিতেই খুঁজে পায়, তখন নিঃসন্দেহে দুনিয়াও তার কাছে এসে পড়ে। কিন্তু আরামের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যায়; সে আর দুনিয়া ও তার ভোগবিলাসে কোনো প্রকৃত আনন্দ বা স্বাদ পায় না। অনুরূপভাবে, নবী ও অলীদের পায়ের কাছে দুনিয়াকে এনে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তারা দুনিয়ার কোনো মজা পায়নি, কারণ তাদের দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। এটি প্রকৃতির এক নিয়ম-যখন মানুষ দুনিয়ার সুখ কামনা করে, তখন সেই সুখ তাকে এড়িয়ে যায়; আর যখন সে সেই কামনা ত্যাগ করে, তখন দুনিয়া তার কাছে আসতে পারে, কিন্তু তার আনন্দ আর অবশিষ্ট থাকে না। এটি একটি দৃঢ় নীতি, যা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

আল্লাহকে লাভ করার সঙ্গে দুনিয়া লাভও সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা বারবার বলেন, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাকে সব ধরনের বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং এমনভাবে রিজিক দেওয়া হবে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। কত বড় নিয়ামত যে মানুষ সব সংকট থেকে মুক্তি পায় এবং আল্লাহ নিজেই তার রিজিকের দায়িত্ব নেন! কিন্তু, যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, এটি তাকওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত; কোথাও বলা হয়নি যে দুনিয়াবি ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে এসব অর্জন করা যাবে।

আল্লাহর বান্দাদের একটি লক্ষণ এই যে, তারা স্বভাবগতভাবে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ অনুভব করে। সুতরাং, যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের শান্তি লাভ করে, তার উচিত এই পথ গ্রহণ করা। আর যদি সে এই পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে, তবে যতই চেষ্টা করুক-কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

অনেকেই এই উপদেশ অপছন্দ করবে এবং উপহাস করবে, কিন্তু তারা যেন স্মরণ রাখে-এক সময় আসবে, যখন তারা এই কথাগুলোর সত্যতা বুঝতে পারবে এবং আক্ষেপ করে বলবে: 'হায়! আমরা তো বৃথাই আমাদের জীবন নষ্ট করেছি।' কিন্তু তখন সেই অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না। প্রকৃত সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর আহ্বান এসে যাবে।"(মালফুযাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৯৫)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

একজন ওয়াক্‌ফে নও জিজ্ঞাসা করল: আল্লাহ তা'আলা যখন মাদকদ্রব্য হারাম করেছেন, তাহলে সিগারেট কেন হারাম করা হয়নি?

উত্তর: হুযূর (আবা) বলেন যে, পবিত্র কুরআনে মদকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ এর ক্ষতি এর উপকারের চেয়ে বেশি। যখন একজন মানুষ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে, তখন তার হুঁশ ঠিক থাকে না।

তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার আগে এক সাহাবী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মহানবী (সা.)-কে অনুপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে নেশা মানুষের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সৃষ্টি করে, এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এটিকে হারাম করেছেন।

সিগারেট ও তামাক সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, তিনি এটিকে সরাসরি হারাম বলেন না, তবে এটি একটি মন্দ ও অপছন্দনীয় জিনিস। তিনি আরও বলেন, যদি এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে থাকত, তবে তিনি অবশ্যই এটিকে হারাম ঘোষণা করতেন।

হুযূর (আই.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে,হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে অবস্থান করেছিলেন যেখানে লোকেরা হুক্কা পান করত। হুক্কার কারণে সেখানে আগুন লেগে যায়। তখন তিনি এটিকে অপছন্দ করেন এবং বলেন এটি একটি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ও ক্ষতিকর কাজ। এটি শুনে যারা হুক্কা ব্যবহার করত তারা তাদের হুক্কা ভেঙে ফেলে।

অতএব, প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তুই ক্ষতিকর। তবে তামাকের নেশা মদের মতো নয়। তবুও আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে যে তামাক ব্যবহারের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগ হতে পারে।

প্রশ্ন:যদি কোনো হিন্দু বা খ্রিস্টান তার ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং তার দোয়া কবুল হয়, তাহলে তাকে কীভাবে ইসলামের দিকে এবং এক আল্লাহর দিকে আনা যেতে পারে?

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ এক-মানুষ তাঁকে ভগবান, পরমেশ্বর বা God যাই বলুক না কেন। হিন্দুরা বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করেছে এবং মনে করে এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহর 'রহমানিয়্যাত' (সর্বজনীন দয়া) সর্বত্র কার্যকর। এর মাধ্যমে আল্লাহ সব মানুষকে-হিন্দু, খ্রিস্টান বা অন্য যে-ই হোক-রিযিক দান করেন।

হুযূর (আবা) বলেন, যখন মানুষ বিপদে পড়ে-যেমন সমুদ্রে ঝড়ের সময়-তখন তারা আল্লাহকে ডাকে, আর তিনি তাদের রক্ষা করেন। কিন্তু পরে তারা আবার অবাধ্য হয়ে যায়। এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর দয়া সর্বদা কার্যকর।

এমনকি নাস্তিকরাও, যারা আল্লাহকে মানে না, তারাও আল্লাহর এই রহমতের গুণের মাধ্যমে না চাইলেও রিযিক পেয়ে থাকে।

তিনি একটি উদাহরণ দেন: এক মেয়ে, যে আল্লাহতে বিশ্বাস করত না, বলেছিল যে কঠিন সময়ে সে আশা রাখবে। তখন তাকে বলা হয়-তুমি যাঁর ওপর আশা রাখছো, তিনিই আসলে আল্লাহ।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য মানুষের দোয়া কবুল করেন, এমনকি তাদেরও, যারা দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করে এবং যেখানে এখনো ইসলাম পৌঁছেনি।

আল্লাহ বলেন, তিনি "রব্বুল আলামিন-সমস্ত জগতের পালনকর্তা। তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসি-সবার জন্যই রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

তবে এটি এই অর্থে নয় যে তাদের ধর্ম সত্য হওয়ার প্রমাণ হিসেবে তাদের দোয়া কবুল হচ্ছে; বরং এটি আল্লাহর সাধারণ রহমতের ব্যবস্থার অংশ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, দোয়া কবুল হওয়া একটি শক্তিশালী প্রমাণ। মুসলমানদের উচিত আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজেরাও এই নিদর্শন দেখাতে পারে এবং অন্যদেরও দেখাতে পারে।

সব ধর্মই মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং সত্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অনুসারীরা সেগুলো বিকৃত করেছে। সময়ের সাথে সাথে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন, এবং এর চূড়ান্ত রূপ হলো পবিত্র কুরআন, যা পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অতএব, ইসলামই চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ধর্ম।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, মুসলমানরাও অনেক ভুল শিক্ষার সংযোজন করেছিল, এজন্যই রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ ও মাহদী প্রেরিত হয়েছেন, যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

প্রশ্ন: আমরা নারীদের সঙ্গে হাত মেলাই না। কিন্তু যদি কোনো অনুষ্ঠানে কোনো নারী হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে কী করা উচিত?

উত্তর:হুযূর (আই.) পরামর্শ দেন যে, অনুষ্ঠানের আগে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আমরা হাত মেলাই না।

তিনি বলেন, তিনি যেখানে যান, সেখানকার আয়োজকদের আগেই এ বিষয়ে অবহিত করেন, যাতে কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি না হয়।

তবে যদি কোনো অনিবার্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং ওই মহিলা বিষয়টি না জানেন, তাহলে তাকে বিব্রত করা থেকে বাঁচাতে হাত মেলানো যেতে পারে। এটি বাধ্যতামূলক অবস্থায় অনুমোদিত।

প্রশ্ন:একজন ওয়াক্‌ফে নও বললেন, তিনি ব্যবসায় মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। এখন কী করা উচিত?

উত্তর:হুযূর (আই.) তাকে লিখে পরামর্শ নিতে বলেন। যদি আরও পড়াশোনা করলে যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, তবে তা করা উচিত।

প্রশ্ন:জামা'আতের খেদমতে আসার আগে কি কেউ তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে?

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, প্রতিটি বিষয় আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদি জামা'আতের প্রয়োজন থাকে, তাহলে জামা'আত ঋণের দায়িত্ব নিতে পারে। অন্যথায়, তাকে চাকরি করে ঋণ পরিশোধ করতে বলা হবে।

প্রশ্ন:জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি কোনো শর্ত আছে?

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, যারা যোগ্যতা অর্জন করবে তারাই জান্নাতে যাবে। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন একটি সময় আসবে যখন জাহান্নাম খালি হয়ে যাবে এবং জান্নাত পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই সৎকর্ম করা উচিত।

প্রশ্ন:একজন যুবক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করার পর ক্যারিয়ার সম্পর্কে পরামর্শ চায়।

উত্তর:হুযূর (আই.) তাকে আর্কিটেকচার বা ডিজাইনিং-এর মতো ক্ষেত্রে যেতে পরামর্শ দেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আমি তোমাদিগকে উপার্জন ও শিল্পকার্য করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকদের অনুগামী হয়ো না যারা সংসারকেই সব কিছু মনে করে। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

প্রশ্ন:কারও নাম যদি "আব্দুর রহমান"হয় কিন্তু তাকে শুধু "রহমান"বলা হয়, এটি কি সঠিক?

উত্তর:হুযূর (আই.) বলেন, "রহমান"আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। তাই পূর্ণ নাম "আব্দুর রহমান"ব্যবহার করাই উত্তম।

প্রশ্ন:পাকিস্তানের কিছু আলেম বলেন, টাখনুর নিচে প্যান্ট থাকলে নামাজ হয় না–এটি কি সঠিক?

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, এরকম কোনো নিয়ম নেই। রসূলুল্লাহ (সা.) অহংকার ও দম্ভের কারণে লম্বা পোশাক পরতে নিষেধ করেছিলেন–পোশাকের দৈর্ঘ্যের জন্য নয়।

কিছু সাহাবী টাখনুর নিচে পোশাক পরতেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অহংকার ছিল না, তাই তাদের নিষেধ করা হয়নি। সুতরাং এটি কিছু আলেমের ভুল ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন:শিশুদের কি অল্প বয়সে বাই'আত নেওয়া উচিত?

উত্তর:হুযূর (আবা) বলেন, যখন একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হবে, তখন সে বুঝে–শুনে ও পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে বাই'আত গ্রহণ করা উচিত।

হযরত খলিফাতুল মসীহের সাথে ওয়াকফে নও বালিকাদের ক্লাস

এরপর কর্মসূচি অনুযায়ী ওয়াকফে নও বালিকাদের একটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর সাথে।

অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা পেশ করেন আজিজা আতিফা তারিক এবং এর উর্দু অনুবাদ পেশ করেন আজিজা মাহীন আশফাক।

পরবর্তীতে আজিজা সাইরা আহমদ মালিক মহানবী মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করেন:

"হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: 'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না?' আমরা বললাম, 'জি, অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করা এবং পিতা–মাতার অবাধ্য হওয়া।' তখন তিনি হেলান দিয়ে ছিলেন, পরে সোজা হয়ে বসে জোর দিয়ে বললেন: 'সাবধান! তৃতীয় বড় গুনাহ হলো মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।' তিনি এ কথাটি এতবার পুনরাবৃত্তি করেন যে আমরা কামনা করছিলাম, যদি তিনি থামতেন।"

(সহীহ আল–বুখারী, আদব অধ্যায়, পিতা–মাতার অধিকার)

এই হাদিসটির ইংরেজি অনুবাদ পেশ করেন নায়লা আহমদ।

এরপর চারজন বালিকা–আজিজা মনসুরা মাহমুদ, নুশনা মুজাফ্ফর, আয়েশা আল–রাযিয়া এবং আজিজা আয়েশা মাসউদ–সমবেতভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর একটি নযম পরিবেশন করেন:

এরপর আজিজা ফারিহা প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)–এর লেখনী থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন:

"পবিত্র কুরআন যেখানে পিতা–মাতার আনুগত্য ও সেবার নির্দেশ দেয়, সেখানে এ কথাও বলে: 'তোমাদের প্রতিপালক ভালো জানেন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও, তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল।' আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অন্তরের অবস্থা ভালো করেই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়াদের জন্য ক্ষমাশীল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)–এর সামনেও এমন পরিস্থিতি এসেছিল, যখন দ্বীনি কারণে তাদের পিতা–মাতার সঙ্গে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও তোমাদের উচিত সর্বদা তাদের কল্যাণ ও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। যখনই কোনো সুযোগ পাও, তা হাতছাড়া করো না। তোমাদের নিয়তের প্রতিদান অবশ্যই তোমরা পাবে। যদি কেবল দ্বীনের কারণে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য পিতা–মাতার থেকে পৃথক হতে হয়, তবে তা একপ্রকার বাধ্যবাধকতা। সংশোধনকে লক্ষ্য রাখো, নিয়তের পবিত্রতা বজায় রাখো এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকো। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়; ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)–এর জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অধিকারই অগ্রগণ্য। সুতরাং আল্লাহ্?কে অগ্রাধিকার দাও, এবং নিজের পক্ষ থেকে পিতা–মাতার অধিকার আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাও, তাদের জন্য দোয়া করতে থাকো এবং নিয়তের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখো।" (মালফুজাত, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৩১)

এরপর হযরত খলিফাতুল মসীহ (আই.) বালিকাদের জিজ্ঞেস করেন: "ওয়াকফে নও বলতে কী বোঝায়?

হযরত ব্যাখ্যা করে বলেন: "ওয়াকফে নও বলতে সেইসব ছেলে–মেয়েদের বোঝায়, যাদের জীবন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা হয়। এই ওয়াকফ তাদের জন্মের আগেই তাদের পিতা–মাতা করে থাকেন, এবং পরে বড় হয়ে তারাও নিজেরা এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।" তিনি আরও বলেন: "অতএব এর অর্থ হলো, ওয়াকফে নও সন্তানদের অন্যদের তুলনায় বেশি আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে হবে, বেশি শিখতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এখন এই সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠবে? নামাজ আদায়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত ও সঠিকভাবে আদায় করো, এবং মাঝে মাঝে নফল নামাজও পড়ো। বড় মেয়েরা বিশেষভাবে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করবে, যখনই তাদের জন্য অনুমতি থাকে। তবেই তোমরা ভালো ওয়াকফাতে নও হতে পারবে; অন্যথায় এর কোনো প্রকৃত উপকার হবে না। এরপর যখন তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, তখন জামাতের খেদমতে নিয়োজিত হবে।"

প্রশ্নোত্তর পর্ব

এরপর, হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ (আই.) ওয়াক্‌ফে নও কন্যাদের প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেন।

একজন ওয়াক্‌ফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, যদি কোনো সমস্যার কারণে সে তার পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে না পারে, বিয়ে হয়ে যায় এবং সন্তান হওয়ার পর তাদের লালন–পালন ও গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে কীভাবে সেবা করবে এবং নিজের ওয়াক্‌ফ পূরণ করবে?

উত্তরে হযরত বলেন যে, সে যেন নিয়মিত নামাজ আদায় করে, দোয়া করে এবং নিজের সন্তানদের উত্তম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) প্রদান করে–এটাই তার ওয়াক্‌ফের মানদণ্ড হবে।

হযরত আরও বলেন: সন্তানের লালন–পালন নিজেই একটি বড় সওয়াবের কাজ। একবার এক মহিলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর সভায় এসে বললেন, "আমাদের পুরুষরা জিহাদে যায় এবং দ্বীনের সেবা করে। তারা বাইরে অনেক কাজ করে এবং সওয়াব অর্জন করে, আর জিহাদের সওয়াব তো অনেক বেশি। আর আমরা ঘরে বসে তাদের সন্তানদের লালন–পালন করি এবং তাদের ঘরের দেখাশোনা করি–আমরাও কি একই সওয়াব পাব, যদিও আমরা পুরুষদের মতো কাজ করতে পারি না?"এই কথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, তারাও সমান সওয়াব পাবে।

হযরত বলেন: খুব ভালো, তোমরা নেক সন্তান তৈরি করো, তাদের দ্বীনের খাদেম বানাও, এমনভাবে তরবিয়ত করো যাতে তারা দ্বীনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, কুরআন শরীফ পড়ে এবং দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে–এটাই তোমাদের ওয়াক্‌ফ। প্রায় ৯০ শতাংশ ওয়াক্‌ফে নও মেয়েদের প্রধান কাজ হলো তাদের ঘরের তরবিয়ত করা।

হযরত বলেন যে, হাদিসে এসেছে একজন নারী তার ঘরের অভিভাবক–এটি সাধারণ মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু ওয়াক্‌ফে নও মেয়েদের জন্য এই দায়িত্ব আরও বেশি। তিনি আরও বলেন যে, তিনি লাজনার এক ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন–যদি স্বামীরা নামাজ না পড়ে, তবে স্ত্রীদের উচিত তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

আরেকজন ওয়াক্‌ফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, যখন সে হিন্দু ও শিখদের কাছে তবলিগ করে, তখন তার অনেক কষ্ট হয়; অথচ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হয় না, কারণ তারা ইঞ্জিল ও তাওরাত থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে। কিন্তু হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের কাছে কীভাবে দাওয়াত পৌঁছাবে তা সে বুঝতে পারে না।

উত্তরে হযরত বলেন: হযরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযি.)–এর "দীবাচা তাফসীরুল কুরআন" বইটি পড়ো। তোমরা তাঁর সাহিত্য পড় না। যদি পড়ো, তাহলে এই সাহিত্য তোমাদেরকে তবলীগের দিকে পরিচালিত করবে। এছাড়া তাঁর আরেকটি বই "দাওয়াতুল আমীর"আছে, যা ওয়াক্‌ফে নওদের পড়া উচিত। এতে এই যুগের বিষয়াবলি ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "দীবাচা তাফসীরুল কুরআন" বইটি ইংরেজিতে "Introduction to the Study of the Holy Quran"নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রতিটি বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়–এটি কিনতে হবে। প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে নওকে এটি পড়া উচিত। এর প্রথম ৫০–৬০ পৃষ্ঠায় হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে–তাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি তুলে ধরা হয়েছে এবং শেষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন ইসলাম প্রয়োজন। বইটির দ্বিতীয় অংশে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর জীবন আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ অংশে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অতএব, যদি তোমরা এই দুইটি বই–"দাওয়াতুল আমীর"এবং "দীবাচা তাফসীরুল কুরআন–পড়ো, তাহলে তোমরা সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে; অন্তত ৭৫% প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

আরেকজন ওয়াক্‌ফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, যেভাবে হযরত বলেছেন ছেলেদের জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো মুরব্বী হওয়া, তাহলে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কী?

উত্তরে হযরত বলেন, তারা যেন ভালো মেয়ে হয়, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে; যেমন মুরব্বীরা বাইরে গিয়ে তবলীগ করে, তেমনি মেয়েরাও তবলীগ করতে পারে। তারা ঘরে সন্তানদের তরবিয়ত করতে পারে এবং পাশাপাশি দাওয়াতের কাজও করতে পারে। এজন্য হযরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযি.) বলেছেন যে, যদি ৫০% মেয়ের সংশোধন হয়, তবে প্রতিটি জামাতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হবে।

একজন মেয়ে প্রশ্ন করে যে, হযরত তাঁর শৈশবের কোনো স্মরণীয় ঘটনা কি বলতে পারেন, যা কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বা সাহাবীর সঙ্গে সম্পর্কিত?

উত্তরে হযরত বলেন: যখন আমাদের দাদা, হযরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাযি.) ইন্তেকাল করেন–তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ, হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)–এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র–তখন আমার বয়স ছিল ১১ বছর। এর দুই বছর আগে একবার তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাযি.)–এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

এমনটি নয় যে, তিনি যেহেতু তাঁর ছোট ভাই ছিলেন, তাই সরাসরি ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। তিনি তা করেননি; বরং ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আমাকে

(শেষাংশ শেষের পাতায়....)

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{২৫}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার সম্মানিতা মাতাজী বর্ণনা করেছেন যে, যখন মির্জা ফজল আহমদ ইন্তেকাল করেন, তখন কিছুদিন পর হযরত সাহেব আমাকে বলেন: "তোমার সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তির অংশ বণ্টন করার জন্য ফজল আহমদই ছিল, আর সে বেচারাও চলে গেল।"

এই নগণ্য বর্ণনাকারী নিবেদন করছে যে, আমাদের দাদাজানের দুই পুত্র ছিলেন–একজন ছিলেন হযরত সাহেব, যার নাম ছিল মির্জা গুলাম আহমদ, এবং অন্যজন ছিলেন আমাদের তায়া মির্জা গুলাম কাদির সাহেব, যিনি হযরত সাহেবের চেয়ে বড় ছিলেন। আমাদের দাদাজান কাদিয়ানের জমিতে দুটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে সেগুলো তাঁর পুত্রদের নামে নামকরণ করেন। সেই অনুযায়ী একটির নাম রাখা হয় কাদিরাবাদ এবং অন্যটির নাম আহমদাবাদ। পরবর্তীতে কোনোভাবে আহমদাবাদ আমাদের পরিবারের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং কেবল কাদিরাবাদই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, কাদিরাবাদ হযরত সাহেবের সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব সেখানে একটি অংশ পান। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে, প্রায় চল্লিশ বছর পর আহমদাবাদ–যা আমাদের পরিবারের হাত থেকে বের হয়ে অন্যদের কাছে চলে গিয়েছিল–পুনরায় আমাদের কাছে ফিরে আসে, এবং এখন তা সম্পূর্ণরূপে আমরা তিন ভাইয়ের দখলে রয়েছে; অর্থাৎ মির্জা সুলতান আহমদ সাহেবের এতে কোনো অংশ নেই। বর্ণনাকারী আরও নিবেদন করেন যে, কাদিরাবাদ কাদিয়ানের পূর্ব দিকে অবস্থিত, আর আহমদাবাদ উত্তর দিকে অবস্থিত।

{২৬}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (যিনি বর্ণনাকারীর প্রকৃত মামা) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) লুধিয়ানায় নিজের মসীহ হওয়ার দাবী প্রকাশ করেন, তখন আমি ছোট শিশু ছিলাম, সম্ভবত তৃতীয় শ্রেণিতে পড়তাম। এই দাবী সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না।একদিন আমি স্কুলে গেলে কিছু ছেলেরা আমাকে বলল: "কাদিয়ানের সেই মির্জা সাহেব, যিনি তোমাদের বাড়িতে আছেন, তিনি দাবী করেছেন যে হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনিই আগত মসীহ।" ডা. সাহেব বলেন, আমি তাদের প্রতিবাদ করে বলেছিলাম: "এটা কীভাবে সম্ভব? হযরত ঈসা তো জীবিত আছেন এবং আকাশ থেকে অবতরণ করবেন।"

যখন আমি বাড়ি ফিরলাম, তখন হযরত সাহেব বসে ছিলেন। আমি তাঁকে সম্বোধন করে বললাম: "আমি শুনেছি আপনি বলেন যে আপনি মসীহ।" ডা. সাহেব বলেন, আমার এই প্রশ্ন শুনে হযরত সাহেব নীরবে উঠে দাঁড়ালেন, কক্ষে গিয়ে আলমারি থেকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'ফতহে ইসলাম'–এর একটি কপি এনে আমাকে দিলেন এবং বললেন: "এটা পড়ো।" ডা. সাহেব বলতেন, এটি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর সত্যতার একটি প্রমাণ যে, তিনি একটি ছোট শিশুর সাধারণ প্রশ্নকেও এত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন; অন্যথায় তিনি সহজেই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারতেন।

{২৭} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কাজী আমীর হুসাইন সাহেব আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হাদীসে পড়েছিলাম যে মহানবী (সা.)–এর সাহাবীগণ বরকতের জন্য তাঁর চুল সংরক্ষণ করতেন। এই চিন্তা থেকে একদিন আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর নিকট আবেদন করি যে, তিনি যেন আমাকে তাঁর কিছু চুল দান করেন। অতএব, যখন তিনি চুল কাটালেন, তখন তিনি আমাকে তাঁর কিছু চুল পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী নিবেদন করেন যে, আমার কাছেও হযরত সাহেবের কিছু চুল সংরক্ষিত রয়েছে।

{২৮} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কাজী আমীর হুসাইন সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার যখন মাওলভী সাহেব (হযরত খলিফাতুল মসীহ প্রথম) কাদিয়ানের বাইরে গিয়েছিলেন, আমি মাগরিবের নামাজে এসে দেখি যে মসীহ মওউদ (আ.) নিজেই নামাজ পড়াচ্ছেন। কাজী সাহেব বলেন, হযরত সাহেব দুটি ছোট সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর তিলাওয়াতের গভীর আবেগ ও বেদনায় লোকদের কান্নার শব্দ বের হচ্ছিল। নামাজ শেষ করার পর আমি সামনে এগোলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন: "কাজী সাহেব, আমি আপনাকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। এই নামাজে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আপনি ইশার নামাজ পড়ান।" বর্ণনাকারী নিবেদন করেন যে, এটি সম্ভবত প্রাথমিক সময়ের একটি ঘটনা।

{২৯} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মাওলভী শের আলী সাহেব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর গুরদাসপুরে করম দীন–এর সঙ্গে মামলা চলছিল এবং তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, একদিন এমন হলো যে সবাই আদালতে চলে গেল বা অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর কেবল মুফতি সাদিক সাহেব এবং আমি হযরত সাহেবের সাথে রয়ে গেলাম।

হযরত সাহেব শুয়ে ছিলেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমাচ্ছেন। সেই অবস্থায় তিনি মাথা তুললেন এবং বললেন: "আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছে, লিখে নাও।" তখন সেখানে কোনো কলম, কালি বা পেন্সিল ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা রান্নাঘর থেকে একটি কয়লার টুকরো নিয়ে এলাম এবং মুফতি সাহেব তা দিয়ে কাগজে লিখলেন। এরপর তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার আরেকটি ওহী লিখালেন। এভাবে তিনি তখন কয়েকটি ওহী লিখালেন।

মাওলভী সাহেব বলেন সেই ওহীগুলোর মধ্যে একটি তিনি মনে রেখেছেন, তা হলো: "يسئلونك عن شانك قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون

("তারা তোমার মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো 'আল্লাহ', তারপর তাদের তাদের অর্থহীন কথাবার্তায় ছেড়ে দাও।")

পরের দিন যখন তিনি আদালতে উপস্থিত হন, তখন প্রতিপক্ষের উকিল অন্যান্য প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নও করেন: "আপনি আপনার 'তোহফা গোলড়ভিয়া' গ্রন্থে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কথা লিখেছেন,"এবং তিনি বই থেকে একটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনান, যেখানে হযরত সাহেব তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জোরালো ভাষায় লিখেছেন। "আপনি কি সত্যিই নিজের মর্যাদা এ রকমই মনে করেন?

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) উত্তরে বলেন: "হ্যাঁ, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ,"বা এর অনুরূপ কিছু বলেন, যাতে বিষয়টি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

মাওলভী সাহেব বলেন, তখন হযরত সাহেবের মনে হয়নি যে এই প্রশ্ন ও উত্তর তাঁর ওহীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পরে যখন তিনি গুরদাসপুর থেকে কাদিয়ান ফিরছিলেন, তখন আমি পথে তাঁকে বললাম যে, আমার মনে হয় এই ওহী ঐ প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। এতে হযরত সাহেব খুবই খুশি হলেন এবং বললেন: "হ্যাঁ, ঠিক তাই, তুমি খুব ভালোভাবে বুঝেছ।"

মাওলভী সাহেব আরও বলেন, কয়েক দিন পর শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি সাহেব তাঁকে বলেন যে, হযরত সাহেব অন্য এক উপলক্ষেও উল্লেখ করতেন যে, মাওলভী শের আলী এই ওহীর প্রয়োগ খুব ভালোভাবে বুঝেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতেন।

(এই বর্ণনায় 'তোহফা গোলড়ভিয়া' গ্রন্থের যে উল্লেখ এসেছে, সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো– 'হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) 'তোহফা গোলড়ভিয়া'–এর পরিবর্তে 'তিরইয়াকুল কুলুব' নাম লিখেছেন। তবে প্রকৃত বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা অনিচ্ছাকৃত একটি ভুল হয়েছিল এবং সঠিক বিষয়টি এই যে, আদালতে যে বই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তা 'তোহফা গোলড়ভিয়া' ছিল, 'তিরইয়াকুল কুলুব' নয়–যেমনটি দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৯ নম্বর বর্ণনায় আদালতের নথির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে।)

{৩০}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বর্ণনাকারী নিবেদন করেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর অভ্যাস ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির স্বপ্ন মনোযোগ সহকারে শোনা এবং অনেক সময় তা লিখেও রাখা। একবার মির্জা কামালউদ্দিন প্রমুখ মসজিদের নিচের পথটি দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দিয়েছিল, ফলে আহমদিদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল এবং তাঁকে বাধ্য হয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল (এই ঘটনাটি ছাড়া তিনি কখনও নিজে কারও বিরুদ্ধে মামলা করেননি)। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে দেওয়ালটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং আমি তার ভাঙা অংশের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আমি বিষয়টি তাঁকে বললে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং তা লিখে রাখলেন। তখন আমি একেবারেই শিশু ছিলাম।

{৩১} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বর্ণনাকারী নিবেদন করেন যে, ১৯০৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময়, যখন তিনি বাগানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন, তখন মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ মনজুর–যিনি তখন ছোট শিশু ছিলেন–স্বপ্নে দেখেন যে অনেক ছাগল জবাই করা হচ্ছে। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)–কে এই বিষয়ে জানানো হলো, তখন তিনি কয়েকটি ছাগল এনে সদকা হিসেবে জবাই করার নির্দেশ দেন। তাঁর অনুসরণে আরও অনেকেই একই কাজ করেন। আমার ধারণা, তখন বাগানে একশোরও বেশি ছাগল জবাই করা হয়েছিল।

{৩২} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বর্ণনাকারী বলেন, ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পের সময় আমি শিশু ছিলাম। আমরা কয়েকজন শিশু খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম–যে অংশটি হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর বাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের শহরের বাড়ির পাশে অবস্থিত ছিল। হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলে আমরা সবাই ভয়ে উঠে পড়লাম এবং কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। যখন আমরা উঠানে এলাম, তখন উপর থেকে পাথর ও ইটের টুকরো পড়ছিল। আমরা দৌড়ে বড় বাড়ির দিকে গেলাম, যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) এবং আমার সম্মানিত মা একটি ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। সে সময় তিনি নিজেও কিছুটা বিচলিত ছিলেন এবং বড় উঠানে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু চারদিক থেকে শিশুরা তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল, সাথে আমার মা–ও ছিলেন–কেউ এদিকে টানছিল, কেউ ওদিকে–আর তিনি আমাদের মাঝখানে ছিলেন। অনেক কষ্টে তিনি এবং আমরা সবাই মিলে বড় উঠানে পৌঁছালাম। ততক্ষণে ভূমিকম্পের তীব্রতা কিছুটা কমে গিয়েছিল।

এরপর কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর বাগানে চলে গেলেন। অন্যরাও তাদের জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে এসে জড়ো হলো। প্রয়োজন অনুযায়ী সেখানে কিছু কাঁচা ঘর তৈরি করা হলো এবং কিছু তাঁবুও আনা হলো। আমরা দীর্ঘ সময় বাগানেই অবস্থান করলাম। সেই সময় সেখানে স্কুলও বসত। যেন বাগানের মধ্যে একটি ছোট শহর গড়ে উঠেছিল। কী চমৎকার সময়ই না ছিল!

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০–২৫)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

আরব দেশের ভূমি ও তার অধিবাসীরা (চলমান)

প্রাচীন আরবের ধর্মসমূহ

আরেক ব্যক্তি ছিলেন ওয়ারাকাহ বিন নওফল, যিনি হযরত খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি মূর্তিপূজা ত্যাগ করে পরে খ্রিষ্টান হন। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সেগুলোর অধ্যয়ন করতেন। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ওহী নাযিল করেন, তখন তিনি তাঁর সত্যতা স্বীকার করেন এবং সেই অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন।

আরেক ব্যক্তি ছিলেন কুস ইবনে সাঈদাহ, যিনি বকর ইবনে ওয়াইল অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং অত্যন্ত বাকপটু ও বাগ্মী বক্তা ছিলেন। নবুওয়তের পূর্বে মহানবী (সা.) উকাজ মেলায় তাঁর একটি ভাষণ শুনেছিলেন। একবার নবুওয়তের সময় তিনি বলেন যে, তিনি উকাজে কুস ইবনে সাঈদাহর একটি ভাষণ শুনেছিলেন, যা তিনি উটে চড়ে প্রদান করেছিলেন, এবং তিনি তার বাগ্মিতার প্রশংসা করেছিলেন। কুসও শিরক ত্যাগ করে তাওহীদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

আরেক ব্যক্তি ছিলেন উসমান বিন হুয়াইরিস। তিনি মক্কার বাসিন্দা ছিলেন এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করে দ্বীন-এ-হানীফ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি রোম সম্রাটের দরবারে পৌঁছান, তখন খ্রিষ্টান হয়ে যান এবং সেই ধর্মের উপরই তার মৃত্যু হয়। এটি ইসলামের পূর্ববর্তী ঘটনা।

সংক্ষেপে, ইসলামের পূর্বে আরবে বিভিন্ন ধর্ম বিদ্যমান ছিল। তবে এই বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আরবের প্রধান ও সাধারণ ধর্ম ছিল মূর্তিপূজা। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক ছিল অতি অল্প- যেমন আটার মধ্যে লবণ (উর্দু বাকধারা), এবং তারাও ছিল অত্যন্ত অবক্ষয়গ্রস্ত ও ব্যর্থ অবস্থায়, যেমনটি ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করেছেন।

যেমন প্রাচীন আরবের ধর্মসমূহ পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম মিউর লিখেছেন: "মুহাম্মদ (সা.)-এর যৌবনকালে আরব এমন এক জাতি ছিল, যারা স্থির রীতিনীতিতে তথা অচলয়াতনে আবদ্ধ ছিল এবং যে কোনো পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রতি প্রবল বিরোধিতা করত। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সমগ্র ইতিহাসে সম্ভবত এমন কোনো সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন সংস্কার এতটা কঠিন ও নিরাশাজনক ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের পাঁচশত বছরের প্রচেষ্টার ফল ছিল এই যে, দেশে হাতে গোনা কয়েকজন খ্রিষ্টানই দেখা যেত। ইহুদি ধর্ম কিছুটা শক্তিশালী ছিল, কিন্তু প্রচারধর্ম হিসেবে সেটিও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে, মূর্তিপূজা এবং বনি ইসমাঈলের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসের স্রোত চারদিক থেকে উত্তাল হয়ে কাবাঘরের দেওয়ালে আছড়ে পড়ছিল।"

এই অবস্থা শুধু আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি ছিল সমগ্র বিশ্বের জন্য গভীর অন্ধকারের যুগ। সকল ধর্ম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং সর্বত্র পথভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছিল। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ, "স্থল ও জল উভয়েই বিপর্যয় প্রকাশ পেয়েছে।" অর্থাৎ, যেসব ধর্ম ঐশী ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলোও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং যেগুলো ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলোও। এখন চিন্তা করো: যখন পৃথিবীতে অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন সূর্য উদিত হয়; আর যখন ভূমি তপ্ত হয়ে যায়, তখন তা বৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং, আধ্যাত্মিক অন্ধকারের পর কি আধ্যাত্মিক সূর্য উদিত হবে না? আর আধ্যাত্মিক ভূমির তাপ কি আধ্যাত্মিক বৃষ্টি আকর্ষণ করবে না?

আল্লাহ তাআলা বলেন: يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ "আল্লাহ রাত ও দিনকে পরিবর্তন করে থাকেন।" তিনি আরও বলেন: اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا "জেনে রাখো! আল্লাহ মৃত ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন।"

অতএব, হঠাৎ সেই অন্ধকার যুগে এক সূর্য উদিত হলো, যা তার রশ্মি দ্বারা পৃথিবীর চারদিক আলোকিত করে দিল; এবং সেই তীব্র উত্তাপের সময় এক মেঘ উদিত হলো, যা তৃষ্ণার্ত ভূমির উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করল, ফলে শুকিয়ে যাওয়া নদী-নালা আবার প্রবাহিত হতে শুরু করল।

এই সূর্য কোন দিগন্ত থেকে উদিত হলো এবং কীভাবে মধ্যাকাশে পৌঁছাল? এই মেঘ কোন পর্বতের ঢাল থেকে উঠল এবং কীভাবে সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছন্ন করল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর, ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পাওয়া যাবে।

"আর আমার সফলতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।" (চলবে)

যুগ খলীফার বাণী

যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তার জিহ্বাকে সে মিথ্যা থেকে এবং তার অন্তরকে নাপাক খেয়াল ও অপবিত্র চিন্তা থেকে রক্ষা করে না তাকে এ জামাত থেকে কেটে দেয়া হবে। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

জামাআতে আহমদিয়া মাহমুদাবাদ (উড়িষ্যা)-এ মুসিয়ানদের রিফ্রেশার কোর্স

১ ফেব্রুয়ারি মসজিদ নাসিরাবাদ মাহমুদাবাদে মুসিয়ানদের একটি রিফ্রেশার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫৩ জন মুসিয়ান অংশগ্রহণ করেন। মক্কারাম শেখ ওয়াসিমউদ্দিন সাহেব, সদর জামাআত, এই কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন। মক্কারাম হালিম আহমদ সাহেব, জেলা খোরদা ও নয়াগড়ের মুবাল্লিগ ইনচার্জ, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করেন:

* আল-ওসিয়ত পুস্তিকার আলোকে ওসিয়ত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
* নেজামে খেলাফত একটি স্বর্গীয় ব্যবস্থা
* মুসিয়ানদের মর্যাদা ও অবস্থান
* মুসিয়ানদের দায়িত্ব- যেন তারা কুরআন মজীদ শিক্ষা দেয়
* যারা এখনো এই আসমানী ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে মুসিয়ানদের বুঝিয়ে বলা হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা এই রিফ্রেশার কোর্স চলতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এর উত্তম ফলাফল প্রকাশ করুন।

(হালিম আহমদ, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, জেলা খোরদা ও নয়াগড়, উড়িষ্যা)

****

ভারতের বিভিন্ন জামাআতে মুসলেহ মাওউদ দিবসের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান

২০ ফেব্রুয়ারি মুসলেহ মাওউদ দিবস উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন জামাআতে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে আতফালুল আহমদিয়া ও খুদ্দামুল আহমদিয়ার মধ্যে জ্ঞানমূলক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিছু জামাআতে খুদ্দাম ও আতফাল মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মূল পাঠ মুখস্থভাবে উপস্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে পুরস্কারও বিতরণ করা হয়।

যেসব জামাআতে এই অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলোর নাম নিম্নরূপঃ

জামাআতে আহমদিয়া কেরং, তারাকোট (উড়িষ্যা)। লাজনা ইমাআল্লাহ ও নাসিরাতুল আহমদিয়া (কেরং)। জামাআতে আহমদিয়া আমরোহা (উত্তর প্রদেশ)। জামাআতে আহমদিয়া খাজুরি পাড়া (উড়িষ্যা)। জামাআতে আহমদিয়া ক্বারি পাড়া (প:ব:)। পূর্ব আতাপুর (প:ব:)। পাঙ্কাল (উড়িষ্যা)। নলহাটি প:ব:)। বার ছক (উড়িষ্যা)। আলিপুর দুয়ার (প:ব:)। ভরতপুর (প:ব:), হরহরি (প:ব:)। চন্দাপুর (তেলেঙ্গানা)। জামাআতে আহমদিয়া পুঞ্চ (জম্মু ও কাশ্মীর)। (সম্পাদক)

কর্ণাটকের শিমোগা ও চিত্রদুর্গ জেলায় ওয়াক্‌ফে নও-এর প্রথম বার্ষিক ইজতেমা

২৪ ও ২৫ জানুয়ারি শিমোগায় ওয়াক্‌ফে নও-এর প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মুকাররম শাহাবউদ্দিন সাহেব, নায়েব নাজির বায়তুল মাল, সভাপতিত্ব করেন। তিলাওয়াত কুরআন মাজীদ, নজম ও রিপোর্ট উপস্থাপনের পর, বিনীতভাবে আমির জেলা শিমোগা হুযূর আনওয়ার আইদাহুল্লাহ তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ-এর সেই বার্তা পাঠ করে শোনান, যা তিনি হল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়াক্‌ফে নও-এর ইজতেমায় প্রদান করেছিলেন।

এই দিকনির্দেশনামূলক বার্তার পর মুকাররম জাভেদ আহমদ সানওরি সাহেব, মু'আল্লিম সিলসিলা, "ওয়াক্‌ফে নওদের দায়িত্ব" বিষয়বস্তুর উপর বক্তৃতা দেন।

এই দুই দিনের ইজতেমায় জ্ঞানমূলক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশন ২৫ জানুয়ারি বিকাল ৩:৩০টায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় স্থান অর্জনকারীদের মধ্যে সম্মানিত আমির সাহেব জেলা পুরস্কার বিতরণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

ইজতেমার সময় আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল এবং একটি প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে শহীদ তালেয় আহমদের একটি ডকুমেন্টারিও প্রদর্শন করা হয়। এই উপলক্ষে ওয়াক্‌ফে নওদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা যেন এই ইজতেমার উত্তম ফলাফল দান করেন এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন।

(সৈয়দ মুহাম্মদ বশীরুদ্দিন, আমির জেলা শিমোগা ও চিত্রদুর্গ)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 9 Apr 2026 Issue No.15

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

একটি স্বচ্ছ সম্পর্ক ছিল। এটি সত্য কথা যে, তিনি (আ.) নির্জনতা ও একাকিত্ব কে এতটাই ভালোবাসতেন যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ বাস্তবায়নের আদেশ না থাকলে তিনি কখনো জনসমক্ষে আসতেন না।

তিনি (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে নির্জনতা ও লোকালয়ের মাঝে কোনো একটিকে নির্বাচনের অনুমতি প্রদান করেন তবে সেই পবিত্র সত্তার কসম! আমি নির্জনতাকেই বেছে নিতাম। তিনি তো আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে কর্ম ক্ষেত্রে বের করে এনেছেন, নিভৃতচারিতায় আমি যে আনন্দ অনুভব করি তা খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি প্রায় ২৫ বছর যাবৎ নির্জনতায় জীবন অতিবাহিত করেছি, কখনো এক মুহূর্তের জন্যও খ্যাতির আসনে সমাসীন হওয়া পছন্দ করি নি। প্রকৃতিগতভাবে বৈঠকে সময় কাটানো ছিল আমার কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু আদেশদাতার আদেশের কারণে আমি বাধ্য। (হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১–১১৫)

এভাবেই তিনি তাঁর পিতাকে পত্র লিখে সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন। যেন এক যুবরাজের আসন ছিল যা তিনি (আ.) পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর পিতার অধীনে সাতটি গ্রাম ছিল যা তিনি (আ.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় পরিত্যাগ করেছেন। (তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২)

কখনো কখনো তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদেরকেও এ প্রেক্ষাপটে নসীহত করেছেন। একটি ঘটনায় লেখা আছে, মিয়াঁ মুহাম্মদ মূসা সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি কাদিয়ান গিয়েছিলাম। "সেখানে একজন নব্য মুসলমান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর নিকট নিবেদন করেন, হুযূর, আমাকে (বাড়ি যাবার) অনুমতি দিন। [সে অনেক বড়ো জমিদার ছিল।] ফসল কাটার সময় হয়েছে, আমাকে (ফসল) বণ্টন করতে হবে, বর্গাচাষীদেরকে তাদের অংশ প্রদান করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, ফসল কী পরিমাণ? সেই ব্যক্তি নিবেদন করেন, হুযূর, অনেক বেশি! তিনি (আ.) বলেন, আমি তো অনেকগুলো গ্রাম পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার পথ অবলম্বন করেছি। আপনি আরো কয়েকদিন এখানে অবস্থান করে নিজের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত করুন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড-৪. পৃ" ৪২৪)

আর দুনিয়াদারি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিন, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করবেন।

তিনি (আ.) সেই ব্যক্তির অবস্থা জানতেন বিধায় একথা বলেছিলেন, কিন্তু অন্যত্র তিনি (আ.) বলেছেন, পার্থিব কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত নয়; আল্লাহ্ তা'লা যে পুরস্কাররাজি প্রদান করেছেন তারও মূল্যায়ন করা উচিত। (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২২০)

সর্বোপরি সেই নও-মোবাঈকে তরবিয়ত করার জন্য তিনি (আ.) তাকে এই উপদেশ প্রদান করেছেন। তাই এটি পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থা যাচাই করে দেখা উচিত; পার্থিবতায় এতটা মত্ত হওয়া উচিত নয় যে, একেবারেই তলিয়ে যাবে, আবার পৃথিবীকে এতটাও পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, পৃথিবীর প্রাপ্য যে অধিকার রয়েছে তা-ও পদদলিত হবে। সুতরাং ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু একটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র সত্তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না; এক্ষেত্রে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

এগুলো ছিল তাঁর (আ.) ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং ইবাদতের কতিপয় দিক- যা আমি আজ বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে ইবাদতের সঠিক অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন, আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসায় অগ্রগামী হওয়ার তৌফিক দান করুন; আমরা যেন এই রমযানে সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করতে পারি, একইভাবে পরবর্তীতেও যেন এই কল্যাণের প্রভাব আমাদের সাথে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই প্রকৃত মু'মিন ও একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলুন।

এ দিনগুলিতে বিশেষ করে কষ্টে নিপতিত ও মিথ্যা মামলায় জর্জরিত আহমদীদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আহমদী ভাইদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিন। মুসলিম উম্মাহকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিষ্পাপ লোকদেরকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন; আর যদি যুদ্ধ ও ধ্বংস অবধারিত হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা নিরপরাধ মানুষদেরকে তা থেকে সুরক্ষিত রাখুন এবং অত্যাচারীদেরকেই ধৃত করুন। (আমীন)

(সৌজন্যে: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ই মার্চ, ২০২৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura**

'নজারত তালীম'-এর অধীনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক প্রয়োজন

কাদিয়ানস্থিত স্কুলে JBT গ্রেডের কিছু পদ পূরণ করা হবে। পাঞ্জাবি, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু জানা মহিলা প্রার্থীরা, যাদের মধ্যে সেবার মানসিকতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, তারা নজারত দিওয়ান কাদিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত বায়োডাটা ফর্ম পূরণ করে আবেদন জমা দিতে পারবেন। পদের বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলো-

(1) TGT (ট্রেইন্ড গ্র্যাজুয়েট জেনারেল লাইন টিচার) / JBT (জুনিয়র বেসিক টিচার) - (মহিলা শিক্ষক)**

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ৫৫% নম্বরসহ স্নাতক এবং ই.উফ ডিগ্রি, সাথে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)

(2) কম্পিউটার শিক্ষক - (পুরুষ শিক্ষক)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (BCA) ৫৫% নম্বরসহ, এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)

(3) শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক - (পুরুষ শিক্ষক)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (B.P.Ed) ৫৫% নম্বরসহ, এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(4) CTET বা TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(5) শুধুমাত্র UGC অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সনদ গ্রহণযোগ্য হবে।

(6) প্রার্থীর বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে (বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সে ছাড় দেওয়া হতে পারে)।

(7) শুধুমাত্র সেই প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে যারা কেন্দ্রীয় নিয়োগ কমিটির লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ হবে এবং নূর হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী সুস্থ থাকবে।

(8) নির্বাচিত হলে প্রার্থীকে কাদিয়ানে নিজ দায়িত্বে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(9) সাক্ষাৎকারের জন্য কাদিয়ান আসার ক্ষেত্রে যাতায়াত খরচ প্রার্থীকে নিজেই বহন করতে হবে।

(10) সাক্ষাৎকারের তারিখ পরে জানানো হবে।

(11) বায়োডাটা ফর্ম নজারত দিওয়ান অফিস বা নিচের ঠিকানা/ইমেইল থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

(12) আবেদনপত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার স্ব-প্রত্যয়নকৃত কপিসহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে।

(13) ভাতা ও অন্যান্য তথ্যের জন্য নিচের ইমেইল ও ফোন নম্বরে অফিস সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা:

নজারত দিওয়ান, সদর অঞ্জুমান আহমদিয়া, কাদিয়ান - 143516

মোবাইল: 09888232530, 09682627592

অফিস: 01872-501130

ইমেইল: diwan@qadian.in

(৯ পাতার পর....)

ভিতরে পাঠিয়েছিলেন জানাতে যে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। আমি উপরে গেলাম এবং সেখানে এক আপা (হযরত মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা, রহ.) দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাকে জানালাম যে তিনি সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি অসুস্থ ছিলেন এবং শুয়ে ছিলেন, তাই তাঁর বিছানার পাশে একটি চেয়ার রাখা হয়েছিল।

এরপর আমি নিচে গিয়ে হযরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেবকে উপরে নিয়ে এলাম। তিনি ভিতরে গিয়ে চেয়ারটি সরিয়ে রেখে মেঝেতে বসে পড়লেন। সে সময় কার্পেট ছিল না; সাধারণ চাটাই বিছানো থাকত। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর প্রয়োজনীয় কথা বললেন। আমি তখন ৮-৯ বছরের ছিলাম, তাই কী কথা হয়েছে তা জানি না। যাই হোক, পরে তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং পিছনের দিকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনাটি আজও আমার মনে একটি শিক্ষা হিসেবে রয়ে গেছে-খিলাফতের প্রতি কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। যদিও তিনি ভাই ছিলেন, তবুও খিলাফতের সম্মান ও মর্যাদা অগ্রগণ্য ছিল। এ ধরনের বয়োজ্যেষ্ঠদের ঘটনা মানুষের মনে চিরকাল থেকে যায়। সেই শৈশব থেকেই এই ঘটনা আমার মনে গেঁথে আছে-খিলাফতকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। (চলবে)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir